ভূমিকা

হেতমপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকটী প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে "শেরিণা বিবির" সমাধি-মন্দির, "হাতেম খাঁর" সমাধি, "হাপুস্ খাঁর" বাঁধ ও একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন হেতমপুর, আসদগঞ্জ, বরকতিপুর, সীতারামপুর প্রভৃতি যে কয় ভাগে সমগ্র গ্রামখানি বিভক্ত, তাহাতেও ব্যক্তি বিশেষের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত ব্যক্তি ও স্মৃতিচিহ্ন সম্বন্ধে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট বিবিধ প্রহেলিকাময় প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। বহুকাল প্রচলিত এই প্রবাদ পরম্পরা যে নিতান্ত অলীক বা সাধারণের কল্পনাপ্রসূত এরূপ বোধ হয় না, বরং ইহার মূলে হেতমপুরের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যাহা হউক, অপ্রতিহত কাল-প্রভাবে এই গ্রামবাসী বৃদ্ধগণ একে একে ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবাদসমূহও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া আমি বহু অনুসন্ধান-পূর্ব্বক সেগুলিকে লিপিবদ্ধ করি এবং "হেতমপুরের প্রাচীন কাহিনী" নামক একটী প্রবন্ধ স্থানীয় সংবাদপত্র বীরভূম বার্ত্তায় প্রকাশ করি। অনন্তর হেতমপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত কুমার রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের তৃতীয়াত্মজ শ্রীযুক্ত কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর আমাকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ প্রদান করেন এবং উক্ত প্রাচীন কাহিনীর সঙ্গে বর্ত্তমান রাজবংশের বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার আদেশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাজবংশ সম্বন্ধীয় বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় প্রদান করেন। তদনুসারে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে হেতমপুরের প্রাচীন বিবরণ ও দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ত্তমান রাজবংশের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়া সমগ্র পুস্তকখানি "হেতমপুর-কাহিনী" নামে অভিহিত হইল।

প্রথম খণ্ডের প্রাচীন বিবরণ প্রধানতঃ জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কতিপয় ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ও দুই একটি সনন্দ ব্যতীত উহার অন্য প্রমাণ নাই। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই জনশ্রুতিসমূহ যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তাহা নহে। পরন্তু যে সকল প্রবাদ পরস্পর-বিরোধী এবং যাহাদের সামঞ্জস্য বিধানের উপায় নাই, সেগুলি অগত্যা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর ঘটনাবলীর প্রকৃতি অনুসারে অধিকাংশ স্থলেই সময় নিরূপিত হইয়াছে ; সুতরাং উহা যে অবিসংবাদী সত্য, তাহাও বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ অনুসন্ধানে যতদূর পাওয়া সম্ভব, তাহাতে ত্রুটি করি নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণিত হেতমপুর-রাজবংশের অধিকাংশ বিবরণ, উক্ত কুমার বাহাদুরের প্রযত্নে, বর্ত্তমান রাজষ্টেটের দপ্তরখানার বহু পুরাতন পারসী [ফারসি] ও

বাঙ্গলা দলিলপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরেকে রাজা বাহাদুরের পিতা ও পিতামহের সমসাময়িক যে দুই একজন বৃদ্ধ এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেও বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া গিয়াছে। যে যে বিষয়ের যে যে স্মৃতিচিহ্ন বা কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, [তত্তৎস্থলে] তাহার উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

পরিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে উক্ত রাজকুমার বাহাদুর আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান না করিলে এবং এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে, মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা এই লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ঘটনাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। কুমার বাহাদুরের এই অনুগ্রহ ও সহায়তার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম, অলমিতিবিস্তরেণ।

হেতমপুর, বীরভূম
৭ই শ্রাবণ ১৩১৭।

শ্রীকিশোরী লাল সরকার

চন্দ্রনাথ শিবমন্দির

চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরের দরজার উপরের প্যানেল

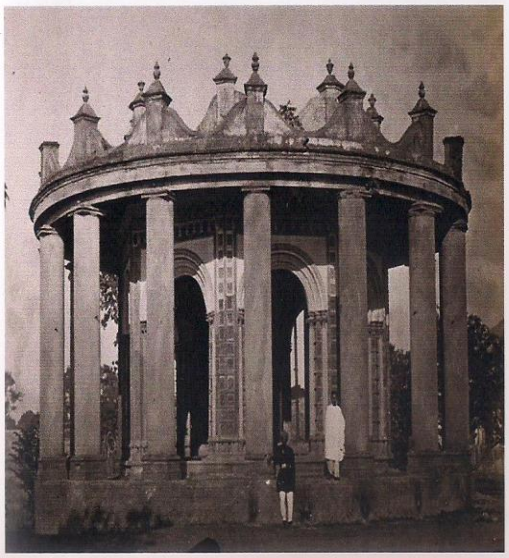

গোলাকার রাসমঞ্চ

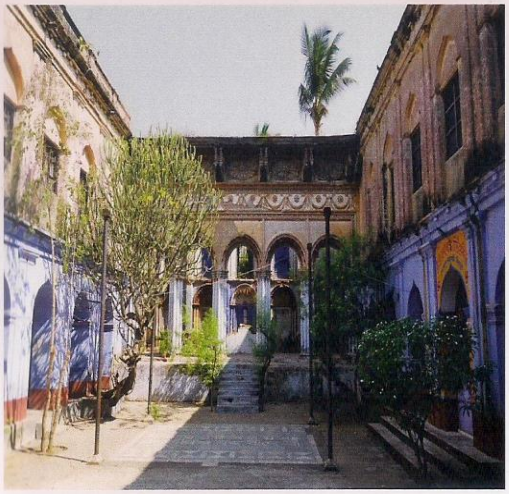

রাধাবল্লভ মন্দির

হেতমপুর-কাহিনী

প্রথম খণ্ড।

ছায়া।

হেতমপুরের বর্ত্তমান অবস্থা।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত হেতমপুর একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। উহা সদর ষ্টেশন সিউড়ির তের মাইল দক্ষিণে ও অণ্ডাল–সিন্থিয়া [সাঁইথিয়া] কর্ড লাইনের দুবরাজপুর ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। গ্রামখানি অতিশয় বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহা প্রধানতঃ হেতমপুর, রাধাবল্লভপুর, আসদগঞ্জ, বরকতিপুর বা বজরপুর, সীতারামপুর, রসিকবাজার ও ধামুড়িয়া– এই কয় ভাগে বিভক্ত। গ্রামে হিন্দু, মুসলমান, ভদ্র, ইতর, সকল শ্রেণীর লোক বাস করে এবং সমগ্র গ্রামের অধিবাসি-সংখ্যা সার্দ্ধসহস্রেরও অধিক হইবে। স্বনামধন্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ইহার বর্ত্তমান অধিপতি ; তদনুসারে ইহা "হেতমপুর রাজধানী" বা "হেতমপুর রাজবাটি" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[১]

হেতমপুরের দৃশ্য অতীব মনোমুগ্ধকর। গ্রামের উত্তরে প্রথমতঃ শস্যক্ষেত্র, তৎপরে "গিরিডাঙ্গা" নামক সুদূর প্রসারিত প্রান্তর। এই প্রান্তরের মধ্যস্থলে রাজা বাহাদুরের একটি উদ্যান-বেষ্টিত প্রাসাদ আছে।[২] এই স্থানের সুস্নিগ্ধ দৃশ্য, উত্তপ্ত মরু প্রদেশবর্ত্তী ওয়েসিস্ সদৃশ। গ্রামের মধ্যে কোনও সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইলে রাজপরিবার এই শান্তিময় স্থানে বাস করিয়া থাকেন।

গ্রামে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উভয় দিকেই কিয়দ্দূর প্রান্তর, তৎপরে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রসমূহ প্রাবৃটকালে সুন্দর শ্যামল শোভায় সুশোভিত ও হেমন্তে কনককান্তিবিভূষিত হয়, আবার কখন শস্যশূন্য হইয়া ভোগবিলাসের পরিণাম প্রদর্শন করে। [পূর্ব দিকের] প্রান্তরের মধ্যে শেরিণা বিবির সমাধি-মন্দির ও গৃহের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধিস্থলের পূর্ব্বাংশে "হাপুস্ খাঁর বাঁধ" নামক একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে ; ইহার বিশাল গর্ভে বর্ত্তমানকালে শত শত শস্যক্ষেত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। বাঁধের অনতিদূরে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শেরিণা বিবির সমাধি-মন্দির, হাপুস্ খাঁয়ের বাঁধ ও এই ভগ্নদুর্গের বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে আলোচিত হইবে। দক্ষিণে শস্যক্ষেত্রের পরেই ক্ষীণ কলেবরা "শালনদী"। বর্ষাগমে ক্ষুদ্র তটিনীর কুলপ্লাবী তরঙ্গে উভয় তীরস্থ ক্ষেত্রসমূহ সমধিক উর্ব্বর ও শস্যশালী হয়।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে একটি অরণ্য আছে, উহা প্রধানতঃ বিশাল শালতরু দ্বারা সুশোভিত ও মধ্যগামী রাজপথ দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। বনের উত্তরাংশ "আঁধারকুলি" ও দক্ষিণাংশ "তালবেড়িয়া" নামে পরিচিত। ঋতুরাজ বসন্ত সমাগমে বনবিটপীসমূহ দীর্ঘকাল পরিহিত পুরাতন পত্রবাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নবীন পল্লবে ও কুসুমভূষণে সুসজ্জিত হইয়া থাকে এবং মলয়ানিলসঞ্চালিত সেই কুসুমসৌরভ দশদিক আমোদিত করে। ফলতঃ সেই ভ্রমরগুঞ্জিত ও কোকিলকূজিত বসন্তের বনস্থলী একাধারে বিলাসীর বিলাসকুঞ্জ ও বিরাগীর শান্তিনিকেতন।

বনের পশ্চিম প্রান্তে পথিপার্শ্বে "মান সরোবর" নামে একটি স্বচ্ছসলিলা সরসী, তাহার তীরে ছাত্রাবাস, চতুষ্পাঠী এবং নবনির্ম্মিত এন্ট্রান্স স্কুল। এই স্থানটি সতত অধ্যয়নশীল ছাত্রবৃন্দের মধুর অধ্যয়নরবে মুখরিত। বিশেষতঃ নির্জ্জন অরণ্যপ্রান্তে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, পুরাকালের সেই শিষ্যপরিবৃত ঋষির আশ্রম বলিয়া বোধ হয়।

বনের পূর্ব্বাংশে ইষ্টকরচিত "গৌরাঙ্গভবন"। তথায় পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেতমর্ম্মরবিনির্ম্মিত বেদিকার উপর "গৌর নিতাই" বিরাজ করিতেছেন। যে রূপের ছটায় একদিন সমগ্র ভারতভূমি আলোকিত হইয়াছিল, এ সেই অপরূপ রূপমাধুরী—ভুবন ভুলান মধুর মূর্ত্তি। গৌরাঙ্গ-মন্দিরের সম্মুখে নাট্যশালা, তৎপরে গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের অনুরূপ আর একটি মন্দিরের মধ্যে স্বর্গীয়া মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই ভক্তিমতী মহারাণীর আন্তরিক যত্নে এই গৌরাঙ্গভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; তজ্জন্য মহারাণীর স্বর্গারোহণের পর, রাজা বাহাদুর গৌরাঙ্গদেবের সম্মুখেই রাজমহিষীর দেবীপ্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির পানে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন রাজরাণী যোগাসনে উপবিষ্টা হইয়া ভক্তিভাবে প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতেছেন।

গৌরাঙ্গভবনের পূর্ব্বাংশে অনুচ্চ ইষ্টক প্রাচীর-বেষ্টিত ও পুষ্পোদ্যান শোভিত গেষ্ট হাউস ও আম্রকাননমধ্যস্থ কাছারী গৃহ। ইহার দক্ষিণে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, তদ্দক্ষিণে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত বহুদ্বার বিশিষ্ট মনোহর "রঞ্জন প্রসাদ"। রঞ্জন প্রাসাদের তুল্য উচ্চ ও বৃহৎ অট্টালিকা বীরভূমের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না ; সর্ব্ব সাধারণে ইহাকে "হাজার দুয়ারী" বলে। বর্ত্তমানকালে রাজপরিবার এই প্রাসাদে বাস করিতেছেন।

রাজভবনের দক্ষিণে কতকগুলি আম্রকানন, মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী ও স্থানে স্থানে বৃহৎ বনস্পতিসমূহ পরিলক্ষিত হয়। আম্রকানন সংলগ্ন একটি প্রাচীন অশ্বত্থমূলে পূর্ব্বভাগে অরণ্যষষ্ঠীর ও দক্ষিণভাগে দক্ষিণাকালীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি বিরাজিতা। এই বৃহৎ বিটপীর শাখার সহিত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিজড়িত হইয়া ঊর্দ্ধে চন্দ্রাতপের আকার ধারণ করিয়াছে। স্বর্গগতা মহারাণী পদ্মসুন্দরী দেবী এই কালিকাদেবীর অধিষ্ঠানভূমির চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকারে একটি অনুচ্চ ইষ্টকমণ্ডপ ও

পুরোভাগে একটি সুন্দর পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহাতে স্থানের শোভা আরও মনোরম হইয়াছে। এই স্থানে আসিলে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তি ও শান্তিরসে আপ্লুত হয়। অনেক যোগী সন্ন্যাসী সময়ে সময়ে এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন। কালিকা দেবী সর্ব্বফলদাত্রী ; লোকে যে কামনা করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করে অচিরে তাহার সেই কামনা পূর্ণ হয়।

গ্রামের অভ্যন্তরে গ্রাম্য ও নাগরিক ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ। কোথাও সুধাধবলিত সৌধমালা, কোথাও পর্ণকুটির শ্রেণী ; কোথাও অভ্রভেদী চূড়বিশিষ্ট দেবমন্দির, কোথাও গ্রাম্য চণ্ডীমন্ডপ, কোনও স্থানে প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাজপথ, কোনও স্থানে অপরিষ্কৃত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথ ; একদিকে ইষ্টকপ্রাচীর-বেষ্টিত মনোহর পুষ্পোদ্যান, অন্যদিকে বাঁশঝাড়, শরঝোপ ও আগাছার জঙ্গল। কোথাও কেরাচি, টমটম, জুড়ি, বাইসিকেল, মটরগাড়ী ছুটিতেছে, আবার কোথাও ধান্যাদি শস্যসমূহের বোঝা লইয়া গোগাড়ী চলিতেছে। স্কুল ও কলেজে, মাষ্টার ও প্রফেসারগণ দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা দিতেছেন, আবার পাঠশালায় গুরু মহাশয় বেত্রহস্তে বালকগণের অন্তঃকরণে ভীতিসঞ্চার করিতেছেন। বালকগণ কোথাও ফুটবল ও টেনিস্ ক্রীড়া করিতেছে, আবার কোথাও হেরে ডুগডগ্ ও ডাঙ্গাগুলি লইয়া উন্মত্ত। পূজা ও পর্ব্ব উপলক্ষে যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ ও খেমটা নাচন হইয়া থাকে, আবার কবির গান ও ঝুমুর নাচের অভাব নাই। সন্ধ্যার সময় দেব-মন্দিরসমূহে কাঁসর ঘন্টার মধুর ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যায় আবার মাদলের বিরাট বাদ্যে ইতর লোকের কর্কশ কণ্ঠে নৈশগগন প্রতিধ্বনিত হইয়ে থাকে। তাই বলিতেছি, এরূপ পল্লী ও সহরের সংমিলিত দৃশ্য—বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী মধুর কৈশোরভাব—খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়।

হেতমপুরে প্রায় সর্ব্ববিধ পূজাপর্ব্ব প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে সরস্বতী পূজা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময় হেতমপুরে সপ্তাহব্যাপী একটী মেলা হয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বিস্তর লোক সমাগত হয়। সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালী-ভোজন, যাত্রা, থিয়েটার, নাচ, গান, নহবৎ ও ব্যান্ডবাদ্য, আতসবাজি ও আলোকসজ্জা প্রভৃতি বিবিধ আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া হইয়া থাকে। ফলতঃ সেই কয়দিন গ্রামখানি জনকোলাহলে ও বাদ্যধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে এবং পতাকাশোভিত এবং আলোকমণ্ডিত হইয়া যেন হাসিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, মনসা পূজা, রাস, দোল, অন্নকূট, চড়ক, গোষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ পূজা ও উৎসব দেখিতে পাওয়া যায়। রাধাবল্লভ, রসিকনাগর, গোপাল, গৌরাঙ্গ, দধিবামন, দক্ষিণাকালী, সিংহবাহিনী, শিব, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, রঘুনাথ, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি কয়েকটি বিগ্রহের নিত্যসেবা প্রতিষ্ঠিত আছে। পূণ্যময় কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসে হরিনাম সঙ্কীর্তন, রামায়ন গান ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে।

বহুকালাবধি গ্রামে একটি হাট আছে। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবারে তথায় বহুবিধ তরকারী ও মৎস্য বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রতি বৃহস্পতিবারে দেশী সূতা ও কাপড়ের আমদানী হইয়া থাকে। এই হাট ছাড়া গ্রামে অনেকগুলি দোকান আছে, তথায় সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায়।

ফলতঃ বর্ত্তমানকালে হেতমপুর যথেষ্ট উন্নত ও সুখসমৃদ্ধিশালী। সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, মনোহর পুষ্পোদ্যান, স্বচ্ছসলিলা সরসী, প্রশস্ত রাজপথ, বিবিধ পণ্যপূর্ণ আপণশ্রেণী, গ্রামের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে। সাধারণের উপকারার্থে স্কুল, কলেজ, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় ও তাড়িতবার্ত্তা সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজা বাহাদুর ও সুযোগ্য রাজকুমারগণ হেতমপুরের পূর্ব্ব গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সতত যত্ন ও প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া থাকেন।

হেতমপুরের বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথ বর্ণিত হইল। অতঃপর এই গ্রাম কখন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কিরূপে স্থাপিত হইয়াছে, এখানে কি কি প্রধান ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং বর্ত্তমান রাজবংশের বিস্তৃত বিবরণ ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত হইবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাঘবানন্দ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত শা-আলমপুর পরগণার পূর্ব্বাংশে শালনদীতীরে রাঘবপুর নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল।[১] গ্রামের পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে জঙ্গল, দক্ষিণে শালনদী, নদীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র, তৎপরে আবার জঙ্গল। এই সমস্ত নিবিড় জঙ্গল নরশোণিতলোলুপ হিংস্র শ্বাপদকুলের আবাসভূমি ও নরহন্তা দস্যুগণের নিভৃত স্থল। রাত্রিকালে এই বনাভ্যন্তর হইতে কখন শার্দ্দূলের ভীম গর্জ্জন কখন বা দস্যুপীড়িত মানবের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া যাইত।

এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে রাঘবানন্দ রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার এই অরণ্যপ্রদেশ নিষ্কর স্বরূপ ভোগ দখল করিতেন।[২] তিনি বহু যত্নে ও বহু চেষ্টায় কতিপয় প্রজা সংগ্রহ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে "রাঘবপুর" নাম রাখিয়া ছিলেন। গ্রামখানি যেমন ক্ষুদ্র, উহার অধিবাসি-সংখ্যাও তদ্রূপ অল্প। রাঘবানন্দ ভিন্ন তথায় অপর কোনও ব্রাহ্মণ বা ভদ্র জাতির বাস ছিল না। ময়রা, মুদি, নাপিত, গন্ধবণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, গোপ, সদ্গোপ, সূত্রধর প্রভৃতি কয়েক ঘর রাঘবানন্দের প্রতিবেশী ছিল। ইহারা কৃষিকার্য্য ও স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এতদ্ভিন্ন মাল, বাগ্দী, চাঁড়াল, ধীবর, হাড়ি, ডোম, বাউড়ি প্রভৃতি সমস্তই ইতর শ্রেণীর লোক বাস করিত এবং ইহাদেরই সংখ্যা অধিক ছিল।

রাঘবপুরে রাঘবানন্দ রায় সপরিবারে বাস করিতেন এবং প্রজাগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন ; রাঘবপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের অধিকাংশ অধিবাসী তাঁহার অনুগত ও বশীভূত ছিল। রায় মহাশয় প্রাণপণে লোকের উপকার ও সাহায্য করিতেন, এজন্য সকলেই তাঁহাকে পিতৃতুল্য ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত ও শক্তি-উপাসক ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে মহাসমারোহে কালী পূজা হইত এবং পূজার পরদিনে পঞ্চগ্রামের ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত। সেই দিন রাঘবপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার গৃহে ভোজন করিত।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বীরভূম রাজনগরের মুসলমান রাজগণের শাসনাধীন ছিল।[৩] স্থানীয় রাজকর্ম্মচারিগণ সময়ে সময়ে রাঘবপুরের

জঙ্গলে শিকার করিতে যাইতেন। একদা শা-আলমপুরের তহশীলদার কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে তথায় শিকার করিতে গিয়াছিলেন এবং দিবাভাগে কতকগুলি নিরীহ বন্যপশুর প্রাণ সংহার করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে "রাঘববেড়া" নামক উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। এই উদ্যান রাঘবপুর প্রান্তে শালনদীতীরে রাঘবানন্দ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তদীয় নামানুসারে "রাঘববেড়া" নামে অভিহিত হইত। উহা রায় মহাশয়ের স্বহস্তরোপিত ও সযত্নরক্ষিত বিবিধ বৃক্ষরাজি দ্বারা সুশোভিত ছিল। গ্রাম ও নদীর নিকটবর্ত্তী মনোমুগ্ধকর স্থান দেখিয়া তহশীলদার তথায় রাত্রিযাপন করিবার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময় রাঘবপুরবাসিনী কতিপয় রমণী কক্ষে কলসী লইয়া নদীর ঘাটে জল লইতে আসিল। ঘাটের অদূরে নদীতীরে তহশীলদার ধীর পদবিক্ষেপে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতেছিলেন ; তিনি দূর হইতে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কৃষক তনয়াকে নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। দুইজন অনুচরকে সঙ্কেত করিবামাত্র তাহারা সেই অসহায়া অবলাকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া শিবির-মধ্যে আবদ্ধ করিল। অনান্য রমণীগণ এই ব্যাপার দেখিয়া কেহ জল লইয়া, কেহ না লইয়া, কেহ বা কলসী ফেলাইয়া ভয়ে পলায়ন করিল। গ্রামবাসিগণ এই সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে রাঘবানন্দকে জানাইল। রাঘবানন্দ এই অত্যাচার-কাহিনী শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তহশীলদারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অপহৃতা রমণীকে পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু তহশীলদার "শিবির-মধ্যে কোনও স্ত্রীলোক নাই" বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন শিবির-মধ্যে আবদ্ধা রমণী রাঘবানন্দের আগমন বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে গ্রামবাসিগণ অধৈর্য্য ও উত্তেজিত হইয়া লাঠিহস্তে উদ্যান-মধ্যে উপস্থিত হইল। রাঘবানন্দ তাহাদিগকে থামাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু লাঠিয়ালগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তহশীলদার ও তদীয় অনুরগণকে আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ উভয় দলের মধ্যে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত হইল। তহশীলদার ও উহার অনুচরবর্গ শিকারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন বলিয়া সদর্পে গ্রামবাসিগণকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু রাঘবপুরবাসিগণ দুর্ব্বল হস্তে লাঠি ধারণ করিত না। তাহাদের লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে অস্ত্রধারিগণের অস্ত্রসমূহ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তখন শিকারী মুসলমানগণ শিবির ও আবদ্ধা রমণীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। তহশীলদার জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া বৃক্ষের উপর অতিকষ্টে রাত্রিযাপন করতঃ পরদিন প্রত্যুষে শা-আলমপুরের কাছারিতে উপস্থিত হইলেন।[৪]

এই দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তহশীলদার অতিশয় ব্যস্ত হইলেন কিন্তু লাঠিয়ালগণের লাঠি স্মরণ করিয়া স্বয়ং আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না, কোম্মর খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সর্দ্দারের উপর বৈর-নির্য্যাতনের ভার অর্পণ করিলেন। কোম্মর খাঁ বিস্তর মুসলমান লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া রাঘববেড়ার

বৃক্ষচ্ছেদন করিতে ও রাঘবপুরবাসিগণের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। নৃশংস মুসলমানগণ গ্রামবাসিগণের গৃহ দগ্ধ করিয়া, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও শস্যক্ষেত্রসমূহ নষ্ট করিয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। গৃহদাহে কত শিশু, কত বৃদ্ধ, কত গৃহপালিত পশুপাখী ভস্মীভূত হইল। নিষ্ঠুরেরা সতীর সতীত্ব ও শিশুর জীবন নাশ করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। তাহাদের ভীষণ অত্যাচারে লোকে ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ও চতুর্দ্দিকে ঘোর হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। রাঘবপুরবাসিগণ গৃহদ্বার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিল।

রাঘবানন্দও বাধ্য হইয়া রাঘবপুর পরিত্যাগ করতঃ আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু তিনি একবারে হতাশ বা নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনি সুযোগ পাইয়া দশ বার খানি গ্রামের লাঠিয়াল একত্র করিয়া এরূপ প্রচণ্ড বিক্রমে কোম্মর খাঁকে আক্রমণ করিলেন যে খাঁ সাহেব রাঘবপুর পরিত্যাগ করিয়া সদলে শা-আলমপুরের কাছারিগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল ; কিন্তু রাঘবানন্দের লাঠিয়ালগণ তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না। তাহারা রাঘবানন্দের পক্ষাবলম্বন করিয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল এবং গভীর নিশীথ সময়ে শা-আলমপুরের কাছারি ঘর পোড়াইয়া এবং মুসলমান লাঠিয়ালগণকে প্রহার করিয়া তথা হইতে তাড়াইয়া দিল।

এইরূপে শা-আলমপুর পরগণায় ক্রমশঃ ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং অত্রত্য মুসলমান অধিবাসিগণ বিদ্রোহিগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া রাজসন্নিধানে প্রতিকার প্রার্থনা করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হাতেম খাঁ।

পাঠান-সর্দ্দার কোম্মর খাঁ রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে তহশীলদার অত্যন্ত বিব্রত হইলেন এবং বিদ্রোহী প্রজাগণকে শাসন করিবার জন্য রাজনগরাধিপতির নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তহশীলদারের দুর্ব্যবহারেই যে এই অনল প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিলেন না, প্রজাগণকে জব্দ করিবার জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজা সাহেবকে জানাইলেন যে শা-আলমপুর পরগণার দশ বার খানি গ্রামের হিন্দুপ্রজা বিদ্রোহী হইয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে শাসন করায় তাহারা কাছারিগৃহ পোড়াইয়া দিয়াছে ও মুসলমান ভৃত্যগণকে মারপিট করিয়াছে।

তৎকালে আসদুল্লা খাঁ রাজনগরের অধিপতি ছিলেন।[১] তিনি বিদ্রোহী প্রজাগণকে শাসন করিবার জন্য হাতেম খাঁ নামক জনৈক বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। হাতেম খাঁ সসৈন্যে রাজনগর হইতে বহির্গত হইয়া যথাকালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং রাঘবপুরের সন্নিহিত কেন্দুলা গ্রামের অনতিদূরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। হাতেম যেমন বুদ্ধিমান তেমনি চতুর ছিলেন। তিনি কেন্দুলা গ্রামের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন মুসলমানের সহিত বিশেষ সদ্ভাব স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শে ও সাহায্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্রোহী প্রজাগণকে শাসন করিলেন। বিদ্রোহিদলের নেতা রাঘবানন্দ রায় এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে পলায়ন করতঃ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু চতুর চূড়ামণি হাতেম খাঁর কুটিল কৌশল-জালে অবশেষে ধৃত হইলেন। হাতেম খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়া কয়েকজন সৈন্যসমভিব্যাহারে রাজনগরে প্রেরণ করিলেন এবং বিদ্রোহী প্রজাগণের নিকট বাকী খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তহশীলদারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় পাঠান-সর্দ্দার কোম্মর খাঁ রাঘবপুরের লাখেরাজ স্বত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হইল এবং জনশূন্য গ্রামে কতিপয় মুসলমান প্রজা বসাইয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিল। কোম্মর খাঁ রাঘবপুরে একটি পুষ্করিণী খনন করাইল ও অনেক জঙ্গল কাটিয়া জমি প্রস্তুত করিল।

রাঘবানন্দ ধৃত হইয়া রাজনগরে আনীত হইলে রাজা সাহেব রাজদ্রোহ অপরাধে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন কিন্তু তাঁহার কতিপয় হিন্দু কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণের

প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করায় তাঁহাদের অনুরোধে পূর্ব্ব আদেশ প্রত্যাহার-পূর্ব্বক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ করিলেন।

রাঘবানন্দ কারারুদ্ধ হইয়া পানাহার পরিত্যাগ করিলেন। কারাধ্যক্ষ অনেক বুঝাইলেন, হিন্দু রাজ-কর্ম্মচারিগণও বুঝাইতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু যবনের গৃহে জলস্পর্শ করিবেন না বলিয়া দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। এইরূপে দিবসত্রয় অনাহারে অতিবাহিত হইল চতুর্থ দিনে রাজা সাহেব নিয়মিত রূপে কারাগার পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তৎপরদিনে শ্যামাপূজা ; রাঘবানন্দ রাজা সাহেবের নিকট তিন দিনের জন্য ছুটি প্রার্থনা করিলেন এবং কালীপূজা করিয়া চতুর্থ দিনে স্বয়ং উপস্থিত হইতে অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু রাজা সাহেব তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। সে বৎসর শ্যামাপূজা করা হইল না ভাবিয়া রাঘবানন্দ বড় মর্ম্মাহত হইলেন।

সেই দিন রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহরের সময়ে বিভাবিকাময় স্বপ্ন দেখিয়া রাজা সাহেবের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে উজিরকে আহ্বান করিলেন এবং স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাঘবানন্দকে তিন দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। রাঘবানন্দ ছুটি পাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে রাজনগর পরিত্যাগ করিলেন। দুর্গোৎসবের পূর্ব্ব হইতে বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় এবং রাঘবপুর পরিত্যাগ করায় তিনি সে বৎসর শ্যামা-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে পারেন নাই ; তজ্জন্য বীরসিংহপুরে গিয়া কালীপূজা করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।[২] তিনি তথায় শ্যামাপূজা সম্পন্ন করিয়া স্বীয় অঙ্গীকার অনুসারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরদিনে রাজনগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা সাহেব মুসলমান হইলেও হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন না। রাঘবানন্দকে ধার্ম্মিক ও কালীভক্ত বলিয়া তাঁহার ধারণা হওয়ায় তিনি তাঁহাকে একবারে কারামুক্ত করিলেন এবং রাঘবপুর প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু রাঘবানন্দ আর সেই জনশূন্যপুরে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারামুক্তির জন্য রাজা সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর রাঘবানন্দের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে তিনি রাজনগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে কাশীবাসী হইয়াছিলেন।[৩]

এদিকে, বিদ্রোহী প্রজাগণকে শাসন করিতে ও তাহাদের নিকট বাকী খাজনা আদায় করিতে হাতেম খাঁর অনেক দিন সময় লাগিল। তিনি যেখানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে হইল, সুতরাং ঝড়, বৃষ্টি ও শীতাতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নিজের এবং সৈন্য ও ভৃত্যবর্গের জন্য আবশ্যক মতো অনেকগুলি গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। এতদ্ভিন্ন হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গাভী, বৎস প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক গৃহ নির্ম্মিত হইল। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আসিয়া অনেকগুলি শ্রমজীবি ইতর লোক তথায় বাস করিল এবং এই সমস্ত ব্যক্তির ও পশ্বাদির আহার্য্য সরবরাহ করিবার জন্য কয়েকটি দোকান বসিল। কার্য্যোপলক্ষে

কত গ্রামের কত লোক অবিরত তথায় সমাগত হইতে লাগিল। এইরূপে যে স্থানটি এক সময় প্রান্তরভূমি ছিল. দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে তাহা একটি ক্ষুদ্র পল্লীর আকার ধারণ করিল।

বিদ্রোহানল সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত ও সমস্ত বাকী খাজনা সংগৃহীত হইলে, রাজনগরাধিপতি হাতেম খাঁকে সসৈন্যে রাজনগরে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু হাতেম খাঁ ভাবিলেন যদি তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া সহসা উঠিয়া যান, তাহা হইলে এই নবস্থাপিত পল্লী উঠিয়া যাইবে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি আরও কিছুদিন তথায় বাস করিবার জন্য রাজা সাহেবের নিকট অনুমতি চাহিলেন। রাজা সাহেব কোনও আপত্তি না করিয়া তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

হাতেম খাঁ এখন সুযোগ পাইয়া এই নূতন পল্লী চিরস্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে নানাস্থানে হইতে প্রজা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিলেন যে যাহারা এই নূতন গ্রামে আসিয়া বাস করিবে, তাহাদিগকে বাস্তু বাটীর জমা লাগিবে না এবং যাহারা জঙ্গল কাটিয়া জমী প্রস্তুত করিবে, তাহদের নিকট প্রথম দুই বৎসর কাল সেই জমীর কোনও জমা লওয়া হইবে না, তৃতীয় বর্ষের জমা চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে আদায় করা যাইবে। এই সংবাদ পাইয়া অনেক গ্রাম হইতে অনেক কৃষিজীবি লোক আসিতে লাগিল। রাঘবপুরের যে সমস্ত প্রজা তহশীলদার ও কোম্মর খাঁর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া গৃহদ্বার পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরে পলাইয়া গিয়াছিল, হাতেম খাঁ তাহাদিগকে অভয় প্রদান-পূর্ব্বক এই নূতন গ্রামে আনাইয়া বসাইলেন। যেমন দুই চারি জন করিয়া নূতন লোক আসিতে লাগিল তেমনি দুই চারি জন করিয়া সৈন্যগণ ক্রমশঃ রাজনগরে প্রেরিত হইতে লাগিল, সুতরাং সৈন্য পরিত্যক্ত গৃহগুলি শূন্য রহিল না, নবাগত অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইতে লাগিল। সৈন্যগণ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি লইয়া সকলেই চলিয়া গেলে পর যে সকল নূতন প্রজা আসিতে লাগিল, তাহারা নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া লইল। এইরূপে দুই বৎসরের মধ্যে সেই ক্ষুদ্রায়ত পল্লী প্রায় দুই শত লোকের আবাসভূমি হইল এবং সেই জঙ্গলের অধিকাংশ আবাদি জমিতে পরিণত হওয়ায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে এই নবাগত অধিবাসিগণের অধিকাংশই কৃষিজীবি মুসলমান।[৪]

যাহা হউক তৃতীয় বৎসরের ফসল সুচারুরূপে উত্তীর্ণ হইলে, হাতেম খাঁ রাজা সাহেবের অনুমতি লইয়া নূতন গ্রামের নূতন প্রজাগণের নয়াবাদি জমির জমা ধার্য্য করিলেন। তিনি বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে যাহাদের নিকট বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগকে কিছু কিছু লাখেরাজ ভূমি প্রদান করিলেন এবং চতুর্থ বৎসরের প্রারম্ভে সমস্ত খাজনা আদায় করিয়া রাজনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা সাহেব হাতেম খাঁর কার্য্য-তৎপরতায় এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি এই নবস্থাপিত গ্রামের নবসংগৃহীত জমার টাকা কিছু মাত্র গ্রহণ করিলেন না, পুরস্কার

স্বরূপ সমস্তই হাতেম খাঁকে প্রত্যপর্ণ করিলেন ; অধিকন্তু, হাতেম খাঁর জীবিতকাল পর্য্যন্ত সেই নূতন পল্লীগ্রাম তাঁহাকে বিনা খাজনায় জায়গীর প্রদান করিলেন।[৫] হাতেম খাঁ বৃদ্ধকালে ঝঞ্ঝাটময় দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনরায় সেই পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্মালোচনা দ্বারা অবশিষ্ট জীবন পরম শান্তির সহিত যাপন করিতে লাগিলেন।

এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হাতেম খাঁ কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়ায় রাজা সাহেব তাহার নাম "হাতেমপুর" রাখিলেন। এই হাতেমপুর শব্দ রূপান্তরিত হইয়া কালক্রমে "হাতমপুর" এবং পরিশেষে বর্ত্তমান "হেতমপুর" নামে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে।[৬]

পাঠান-সর্দ্দার কোম্মর খাঁ ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত রাঘবপুর ভোগ দখল করিয়াছিল। তৎপরে কালচক্রের আবর্ত্তনে রাঘবপুর গ্রামখানি একবারে উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে তথায় জনমানবের সমাগম নাই, কেবল কতকগুলি গৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি রাঘবপুরের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। কোম্মর খাঁ তথায় যে একটী পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল তাহাও "কোম্মর খাঁর বাঁধ" নামে বর্ত্তমান আছে।

সে রাঘবানন্দ নাই সে রাঘবপুরও নাই, সে রাম নাই সে অযোধ্যাও নাই। রাঘবানন্দ বহুযত্নে ও বহুপরিশ্রমে কয়েক ঘর প্রজা সংগ্রহ করিয়া যেখানে রাঘবপুর স্থাপন করিয়াছিলেন আজি তাহা শস্যক্ষেত্রে পরিণত ও "চক রাঘবপুর" নামে পরিচিত। রাঘববেড়ারও সে শ্রী নাই, এখন উহা গুল্মাচ্ছাদিত ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কে বলিবে এখানে পূর্ব্বে গ্রাম ছিল? কালের কি কুটিল গতি! যে স্থানটি এক সময় কতিপয় নরনারীর আবাসভূমি ছিল আজি তাহা শিবাগণের লীলাভূমি হইয়াছে আবার যে প্রান্তভূমিতে জনমানবের সমাগম ছিল না আজি তাহা সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিণত ; কি আশ্চর্য্য! যাহা হউক, যতদিন চক রাঘবপুর ও রাঘববেড়ার অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন রাঘবানন্দের নাম বিলুপ্ত হইবে না।[৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হাফেজ খাঁ।

হাতেম খাঁর শেষ জীবনে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হাতেমপুরে যে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিক উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুত ও মনোরম ; তজ্জন্য উহা উপন্যাসের আকারে বর্ণিত হইল। আশাকরি সহৃদয় পাঠকবর্গ উহা অতিরঞ্জিত বা অলীক উপন্যাস না ভাবিয়া প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

একদা নৈদাঘ দিবাবসানে হাতেমপুরের সুবিস্তৃত প্রান্তরে, বৃদ্ধ হাতেম খাঁ একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, অদূরে পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে জনৈক মুসলমান যুবক নামাজ পড়িতেছেন এবং তাঁহার নিকটে একটি যুবতী বসিয়া আছেন। হাতেম খাঁ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলেন এবং দেখিলেন যুবকের আকৃতি বীরপুরুষের ন্যায় ও যুবতী অনিন্দ্যসুন্দরী। সেই ক্ষীণ সন্ধ্যালোকে যুবতীকে একটি পরী বলিয়া যেন বৃদ্ধের ভ্রম হইল। হাতেম খাঁকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া যুবতী তাঁহার সুন্দর মুখখানি অবগুণ্ঠনাবৃত করিলেন। যতক্ষণ যুবকের নামাজ শেষ না হইল ততক্ষণ হাতেম খাঁ কিছু দূরে নীরবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। নামাজ শেষ হইলে তিনি তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কে?"

যুবক বিনীতভাবে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "আমরা পথিক।"

হাতেম– কোথায় নিবাস?

যুবক– নিবাস বহুদূর, সম্প্রতি পাটনা হইতে আসিতেছি।

হাতেম– কোথায় যাইবেন?

যুবক– মুর্শিদাবাদ।

হাতেম– কি নাম?

যুবক– হাফেজ খাঁ।

হাতেম খাঁ আর কিছু না বলিয়া যুবকের মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

হাফেজ খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নিবাস এই গ্রামে?"

হাতেম– হাঁ, সম্প্রতি এই গ্রামেই বটে।

হাফেজ– মহাশয়ের নাম?

হাতেম– হাতেম খাঁ।

হাফেজ খাঁ সসম্ভ্রমে সেলাম করিলেন। হাতেম খাঁও সেলাম করিয়া বলিলেন "আপনারা বিদেশী পথিক, এ রাত্রিকালে কোথায় থাকিবেন?"

হাফেজ– কোথায় আর থাকিব? গ্রামে সুবিধামত আশ্রয় পাই উত্তম, নচেৎ এই বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

হাতেম– যদি কোনও বিশেষ বাধা না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসিতে পারেন।

"বাধা তেমন কিছু নাই" বলিয়া হাফেজ খাঁ অবগুণ্ঠনাবতী যুবতীর পানে একবার কটাক্ষপাত করিলেন। তদ্দর্শনে হাতেম খাঁ বলিলেন "আমার মত একজন বৃদ্ধ খানসামা ভিন্ন, আমার গৃহে অন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোক নাই ; বোধ হয় আপনাদের কোনও অসুবিধা হইবে না।"

হাফেজ খাঁ সম্মত হইলেন এবং যুবতীকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধের পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেন। ঈষত্তরল [ঈষৎ তরল] প্রদোষতিমির গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিল, তাঁহারাও তিনজনে হাতেমপুরে প্রবেশ করিলেন।

হাতেম খাঁ গৃহে আসিয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে তাঁহাদের আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। হাফেজ খাঁ তাঁহার আতিথেয়তাদর্শনে পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং আহারান্তে উভয়ে বসিয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হাফেজ খাঁ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলিলেন "এই রাত্রিকালে অনুগ্রহ করিয়া গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি ; কিন্তু আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে, অনুমতি পাইলে প্রকাশ করি।"

হাতেম খাঁ ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন "আপনি অসংকোচে জিজ্ঞাসা করুন।"

হাফেজ– আপনার নাম হাতেম খাঁ এবং এই গ্রামেরও নাম হাতেমপুর, আপনি কি ইহার স্থাপয়িতা?

হাতেম– যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা ঠিক।

এই বলিয়া হাতেম খাঁ বিদ্রোহ দমন করিতে আসিয়া কিরূপে হাতেমপুর স্থাপন করিয়াছেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

হাফেজ খাঁ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এই গ্রাম স্থাপন করিয়া এখানে একাকী বাস করিছেন, আপনার পরিবারবর্গ কোথায়।"

অকস্মাৎ হাতেম খাঁর মুখ ম্লান হইল, তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন "সে দুর্ভাগ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। এ হতভাগ্যের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সবই ছিল, কিন্তু সকলেই অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া হাফেজ খাঁ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। হাতেম খাঁ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "আমি আপনাদের প্রকৃত পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি ; যদি কোনও বাধা না থাকে, তাহা হইলে বলুন।"

হাফেজ খাঁ বলিলেন "আমি দিল্লীতে সৈনিকের কার্য্য করিতাম, কিন্তু কোনও কারণ বশতঃ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি দূরদর্শী হাতেম খাঁ হাফেজ খাঁর কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া অবধি সন্দিহান হইয়াছেন। হাফেজ খাঁ যে প্রকৃত পরিচয় গোপন করিলেন, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং স্পষ্টকথা বলিতে কখনও ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন "আমি আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, আপনি আত্মগোপন করিতেছেন।"

হাতেম খাঁর কথা শুনিয়া হাফেজ খাঁ কিছু অপ্রতিভ হইলেন কিন্তু আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে হাতেম খাঁ পুনরায় বলিলেন "দেখুন, আপনাদিগকে উচ্চবংশসম্ভূত বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে এবং বোধ হইতেছে কোনও গুরুতর কারণে আপনারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছেন। যাহা হউক আপনি আমার আশ্রয়ে আসিয়া বিপন্ন হইবার আশঙ্কা করিবেন না, প্রকৃত পরিচয় দিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন"।

হাফেজ খাঁ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "যদি আমাদের প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য আপনার এত আগ্রহ হইয়াছে, তবে বলিতেছি শুনুন ; কিন্তু শুনিবার আগে প্রতিজ্ঞা করুন যে আমাদের বিষয় কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।"

হাতেম-- শপথ করিতে হইবে কি?

হাফেজ-- আপনার মত ধার্ম্মিক ব্যক্তির কথাই শপথ।

হাতেম-- তবে নির্ভয়ে বলুন, ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিবে না।

হাফেজ খাঁ বলিলেন "তবে শুনুন, আপনার মত বিচক্ষণ ব্যক্তির ধারণা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না ; বহুদর্শিতাবলে আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা ঠিক। আমি বা আমার স্ত্রী সামান্য লোকের পুত্রকন্যা নই, তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ এখন দীনভাবাপন্ন হইয়াছি। আমি দিল্লীর প্রধান সেনাপতির পুত্র, আমার নাম হাফেজ ; আর আমার পত্নী অপর একজন সেনাপতির কন্যা, নাম শেরিণা বিবি। এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ললনাকে বিবাহ করিয়া অবধি আমি কি বিপদে পড়িয়াছি, তাহা ঈশ্বর জানেন। মোগল সাম্রাজ্য এখন অধঃপতিতপ্রায় ; দিল্লীর বাদশাগণ এখন নামেই বাদশা, তাঁহাদের কোনও ক্ষমতাই নাই। এখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। এই ঘোর অরাজকতার দিনে অধার্ম্মিকের প্রাদুর্ভাব হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? বর্ত্তমান বাদশার জনৈক লম্পট ভ্রাতুষ্পুত্র শেরিণা বিবির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। সেই দুরাত্মার লোলুপ দৃষ্টি হইতে শেরিণা বিবিকে রক্ষা করিবার জন্য দিল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি ; কিন্তু তাহাতেও নিরাপদ হইতে পারি নাই, সে পামর আমাদের সন্ধানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছে। আজ প্রায় দুই বৎসর হইল ছদ্মবেশে যেখানে সেখানে ভ্রমণ করিতেছি এবং কিছুদিন

হইল এই বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছি ; কিন্তু ভাবিতেছি, জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী নূরজাহানের জন্য হতভাগ্য শের আফগানের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এই শেরিণা বিবির জন্য পাছে আমারও ভাগ্যে সেইরূপ ঘটে।"[১]

হাফেজ খাঁ নীরব হইলেন। এইবার হাতেম খাঁ তাঁহার কথায় কতকটা বিশ্বাস করিলেন এবং বলিলেন "এ বিষয় বাদশাকে জানান নাই কেন? জানাইলে অবশ্যই প্রতিকার হইত।" হাফেজ খাঁ বলিলেন "বাদশা এখন নামেই বাদশা, তাহাত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যের পরিচালক, বাদশা তাঁহাদের হস্তে যন্ত্র পুত্তলিবৎ।"

হাতেম খাঁ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে হাফেজ খাঁ বলিলেন "আপনি এখানে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ; আপনি যদি আমাদিগকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে অনর্থক ভ্রমণজনিত ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাই।"

হাফেজ খাঁর কথা শুনিয়া উদার-চরিত হাতেম খাঁ প্রীতি-বিস্ফারিতনেত্রে হাফেজ খাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তা বেশ ত, আমারই গৃহে থাকুন না? আমার পুত্রকন্যা কেহই নাই, আপনারাই পুত্রকন্যার মতো থাকুন ; এখানে আমি বর্ত্তমানে কেহ কখনও আপনাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না।"

হাফেজ খাঁ আসন হইতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বৃদ্ধের পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন "তবে আর আমাকে "আপনি, আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, আজ হইতে আমি আপনার সন্তান।"

"আজ হইতে আমি আপনার কন্যা" অন্তরাল হইতে বীণানিক্কনবৎ সুমধুর স্বরে শেরিণা বিবি এই কথা বলিলেন। তখন বৃদ্ধ হাতেম খাঁ যারপরনাই পুলকিত হইয়া বলিলেন "মা, তোমাদিগকে দেখিবামাত্র আমার অন্তঃকরণে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছে– জানি না, কেন আজ এ দগ্ধহৃদয়ে অমৃতধারা ছুটিল। আমার মনে হইতেছে, আজ যেন মৃত পুত্রকন্যা ফিরিয়া পাইলাম।"

বলিতে বলিতে বৃদ্ধের কণ্ঠরুদ্ধ হইল, তাঁহার দুই নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা গেল। হাফেজ খাঁ তাঁহার উদারতা দেখিয়া বাস্তবিক মুগ্ধ হইলেন, কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল ; হাতেম খাঁ শয়ন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে হাফেজ খাঁও নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন।

হাতেম খাঁ অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত শেষোক্ত কথাগুলি বলিলেন এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হাফেজ খাঁ এখন তাঁহাকে বেশ চিনিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি বুঝিয়াছেন, সুতরাং তিনিও নিশ্চিন্ত রহিলেন। এদিকে হাতেম বহির্ব্বাটীতে আসিয়া রাজনগরের দূতকে বিদায় করিলেন। তাঁহার কৌশলে এ বিষয় আর কেহ জানিতে পারিল না। পরন্তু তিনি অতি গোপনে রাজা সাহেবকে জানাইলেন যে এ অঞ্চলে বাদশা-তনয়ার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

এইরূপে হাফেজ ও শেরিণা পক্ষপুটে রক্ষিত পক্ষিশাবকের ন্যায় হাতেম খাঁর আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে হাতেম খাঁ অকস্মাৎ সাংঘাতিক পীড়ায় পীড়িত হইলেন। তখন হাফেজ ও শেরিণা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং উভয়ে পর্য্যায়ক্রমে রাত্রি জাগরণ করিয়া পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হাতেম খাঁ মনে করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন কিন্তু তাঁহার সে বাসনা বলবতী হইলেও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার অবকাশ পাইলেন না। তিনি যে আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ পীড়ার সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিলে তিনি সকলের নিকট এই অনুরোধ করিলেন যেন তাঁহার প্রিয়পাত্র হাফেজ হাতেমপুরের ভোগদখল হইতে বঞ্চিত না হন। হাফেজ খাঁও সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার গুণের পক্ষপাতী ছিলেন, সুতরাং এ বিষয়ের জন্য যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন। অন্তর হাতেম খাঁ বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজা সাহেবের বরাবর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে হাতেমপুর মৌজাটি হাফেজ খাঁর নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ থাকিল। পত্র লেখা শেষ হইলে হাতেম খাঁ তাহা স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত করিয়া হাফেজ খাঁর হস্তে দিলেন।

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল, হাতেম খাঁর অবস্থাও তত খারাপ হইতে লাগিল। হাফেজ অনেক যত্ন করিলেন, হাতেমের বন্ধুগণ ও প্রজাগণ চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না, কত কবিরাজ আসিল, কত হেকিম আসিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, হাতেম খাঁ এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন না। মহাত্মা হাতেম খাঁ হাতেমপুর স্থাপন-পূর্ব্বক স্বীয় পবিত্র নাম চিরস্মরণীয় করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে হাফেজ ও শেরিণা পিতৃবিয়োগকাতর সন্তানের ন্যায় শোকার্ত্ত হইলেন। তাঁহারা জনকজননী ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বিদেশে যে শান্তিতরুর শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, নির্দ্দয় কালের কঠোর কুঠারাঘাতে আজ তাহা ভূতলশায়ী হইল। হাতেমের বন্ধুগণ তাঁহার অকৃত্রিম প্রণয় ও

অশেষ গুণাবলী স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং হাতেমের সযত্নপালিত পুত্র-প্রতিম প্রজাগণ আজ যেন যথার্থ পিতৃহীন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। অবশেষে সকলে সমবেত হইয়া মহাত্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

হাতেম খাঁ অতিশয় বুদ্ধিমান, কার্য্যকুশলী ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি রাজনগরের রাজসংসারে উচ্চপদ লাভ করিয়া প্রভূত ক্ষমতা, অতুল সম্মান, বিমল যশঃ ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু কখনও অহংকারী বা বিলাসী ছিলেন না। তিনি গুণবতী ভার্য্যা ও যথাসময়ে পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সকলেই অকালে কালকবলে পতিত হইয়াছিলেন। হাতেম খাঁ বিপত্নীক ও অপত্যহীন হইয়াও ভার্য্যান্তর গ্রহণ করেন নাই। অকালে পুত্রকন্যার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার হৃদয়-প্রবাহিত যে বাৎসল্য স্রোতঃ অকালে প্রতিহত হইয়াছিল, তাহা হাফেজ ও শেরিণার উপর শতধারায় পতিত হইয়াছিল; তজ্জন্য তাঁহারা সমাজবিগর্হিত কার্য্য করিয়াও তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্র হইয়াছিলেন।

হাতেমপুরের মুসলমান-পল্লীপ্রান্তে মহাত্মা হাতেম খাঁর সমাধি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি পল্লীপ্রান্তে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন তাহাও "হাতেম খাঁ" নামে অভিহিত হইতেছে। এই পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে হাতেম খাঁর প্রাচীন সমাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পরে ও ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হাতেম খাঁর মৃত্যু হইয়াছে।[২]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তি।

হাতেম খাঁর মৃত্যুর পর তদীয় বন্ধুগণের মধ্যে কতিপয় প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির সহিত হাফেজ খাঁ রাজনগরে গমন করিলেন এবং রাজা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ও স্বাক্ষরিত পত্র প্রদান করিলেন। তৎকালে আসদুল্লা খাঁ সাহেবের লোকান্তর হওয়ায় তৎপুত্র বদিওজ্জমান খাঁ রাজনগরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাজা বদিওজ্জমান খাঁ গুণগ্রাহী লোক ছিলেন ; তিনি হাতেম খাঁকে অতিশয় ভক্তি ও সম্মান করিতেন এবং শৈশবাবধি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি হাতেম খাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে হাতেম খাঁর অন্তিম অনুরোধ রক্ষা করিবেন না ইহা অসম্ভব। ফলতঃ হাতেম খাঁর ন্যায় হাফেজ খাঁকেও বিনা খাজনায় হাতেমপুর মৌজা বন্দোবস্ত করিয়া নূতন সনন্দ প্রদান করিলেন।[১] হাফেজ খাঁ রাজা সাহেবকে সসম্মানে অভিবাদন করিয়া সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে হাতেমপুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময় হাফেজ খাঁ ও শেরিণা বিবি বিস্তর আস্‌রফি ও বহুমূল্য জহরৎ সঙ্গে আনিয়াছিলেন ; এতদ্ভিন্ন হাতেম খাঁর চির-সঞ্চিত অর্থরাশি তাঁহাদের হস্তাগত হইল। হাফেজ খাঁ এখন সুযোগ পাইয়া ইচ্ছামতো অর্থব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথমতঃ হাতেমপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন। এই বাড়ী সদর ও অন্দর দুই মহলে বিভক্ত। সদর মহল একটি প্রাচীর দ্বারা ও অন্দর মহল দুইটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সদর মহলে বৈঠকখানা, পদাতিক ও ভৃত্যগণের বাসগৃহ, অস্ত্রাগার, চিড়িয়াখানা, পশুশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। অন্দর মহলে দুইখানি দোতালা গৃহ ও পাকশালা নির্ম্মিত হইল। এতদ্ভিন্ন প্রাঙ্গনে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খোদিত হইল। শেরিণা বিবি ও তাঁহার কতিপয় বাঁদী অন্দর মহলে বাস করিতেন। অন্দর মধ্যেই পুষ্করিণী থাকায় স্নান ও পানীয় জল আনয়ন-জন্য বাঁদীগণের গৃহের বাহির হইত না। সদর মহলে পদাতিক ও ভৃত্যগণের স্নান ও পানীয় জলের জন্য হাফেজ খাঁ এই বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে অনতিদূরে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর নাম দহ খাঁ অর্থাৎ খাঁর পুকুর। দহ খাঁ পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইলে হাফেজ খাঁ অবশিষ্ট জঙ্গল কাটাইয়া অনেক জমি প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃষ্ণনগর নামক পল্লীগ্রামের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত বৃহৎ জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ পরিস্কার করাইয়া তথায় একটি ক্ষুদ্রগড় নির্ম্মাণ করাইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে এই দুর্গ প্রাচীরে ঈষদুন্নত হইলে অর্থাৎ দুই তিন হাত উঠিলে তদুপরি সাত জন অশ্বরোহী পাশাপাশি হইয়া এক সঙ্গে অশ্ব পরিচালনা করিয়াছিলেন ; ইহাতে দুর্গ প্রাচীরের প্রস্থ কিরূপ ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। হাফেজ খাঁ স্থানীয় মুসলমান ও বাঙ্গালীর মধ্যে বলিষ্ঠ ও সাহসী যুবা মনোনীত করিয়া একটি সৈন্যদল গঠিত করিলেন এবং নিজেই তাহাদিগকে যুদ্ধ-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন।

এই গড় ও বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া দুর্গ প্রাচীর নির্ম্মিত হওয়ায় তথায় বায়াত্তরটি ছোট বড় পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই পুষ্করিণী সমূহের জলে কৃষিকর্ম্মের যথেষ্ট উপকার হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে হাফেজ খাঁ ঐ সমস্ত পুষ্করিণী ভাঙ্গিয়া একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট সুদীর্ঘ বাঁধ বাঁধাইলেন। তিনি কৃষিকর্ম্মের উন্নতিকল্পে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া এই বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করায় প্রজাপুঞ্জের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইলেন।[২] শুনিতে পাওয়া যায় যে গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় সময় হাফেজ খাঁ প্রিয়তমা শেরিণার সহিত নৌকারোহণ-পূর্ব্বক এই বাঁধের জলে শীতল সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিয়া বেড়াইতেন এবং তরণীযোগে কখন বাড়ী হইতে গড়ে, কখন বা গড় হইতে বাড়ীতে গমনাগমন করিতেন।

হাফেজ খাঁর সেই বাড়ীর ও গড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং সেই বাঁধের প্রভূত বারিরাশি দ্বারা এখনও অনাবৃষ্টির দিনে কৃষিকর্ম্মের যথেষ্ট আনুকুল্য সাধিত হইতেছে। হাফেজ খাঁর প্রস্তুত বলিয়া লোকে ইহাকে "হাফেজ খাঁর বাঁধ" বলিত ; কিন্তু কালক্রমে তাহা রূপান্তরিত হইয়া এখন "হাপুস্ খাঁর বাঁধ" বলিয়া অভিহিত হইতেছে।[৩]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভবিষ্যদ্বক্তা ফকির।

কিছুদিন পরে শেরিণা বিবি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। তদ্দর্শনে হাফেজ খাঁর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সপ্তম দিবসে আকিকা উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন এবং তদুপলক্ষে হাতেমপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের যাবতীয় মুসলমানগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন।[১]

মহাসমারোহে উৎসব আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাসময়ে হাফেজ খাঁর গৃহে সমাগত হইলেন এবং বিনা নিমন্ত্রণে কত ভিক্ষুক কত ফকির আসিয়া উপস্থিত হইল। হাফেজ খাঁ বিনীত ভাবে সকলের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিলেন। ইত্যবসরে ফকিরের দলে এক জন্য নব্য ফকির অন্যান্য ফকিরগণের সহিত কথাপ্রসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন "আমি হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারি ও লোকের ভাগ্যফল নির্ণয় করিতে পারি।"

সেই নব্য ফকিরের এই কথা অনেকেরই কর্ণগোচর হইল, হাফেজ খাঁও শুনিতে পাইলেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ তত গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু হাফেজ খাঁ সেই ফকিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ভূত ভবিষ্যৎ গণনা করিতে পারেন?"

ফকির উত্তর করিলেন "হাঁ পারি।"

"আচ্ছা আমার সঙ্গে আসুন" বলিয়া হাফেজ খাঁ ফকিরকে সঙ্গে লইয়া কোনও একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে যত্ন ও সমাদর-পূর্ব্বক বসাইয়া বলিলেন "আমার হাত দেখিয়া গণনা করুন দেখি।"

ফকির কিছুক্ষণ হাফেজ খাঁর দক্ষিণ করতল দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "আপনি আত্মীয়-স্বজন বিরহে কিছুকাল কষ্টভোগ করিয়াছেন।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া আবার বলিলেন "কোনও কারণে ভীত হইয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন।"

হাফেজ খাঁ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পুনরায় বলিলেন "আচ্ছা, আমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ গণনা করুন দেখি।"

ফকির পুনরায় হাত দেখিয়া মৃদু অস্ফুটভাষায় কি বলিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল পরে বলিলেন "বর্ত্তমানে আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কোনও অমঙ্গল দেখিতেছি না।"

হাফেজ– সে কথা বলাই বাহুল্য ; আমার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা আপনি যেমন দেখিতেছেন, আমিও তদ্রূপ দেখিতেছি এবং আর দশ জনেও তাহাই দেখিতেছে।

ফকির– তবে আপনি কি বলিতেছেন?

হাফেজ– ভবিষ্যতের কথা জানতে চাই।

ফকির– ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ; এই অন্ধকারের মধ্যে অনেক বিষয় লুক্কায়িত থাকে। আপনি তন্মধ্যে কি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলুন।

হাফেজ– আচ্ছা বলুন দেখি, আমার কোনও শত্রু আছে কিনা?

ফকির অনেকক্ষণ হাত দেখিয়া ভ্রূভঙ্গী-পূর্ব্বক বলিলেন "শত্রু আছে কিন্তু বহুদূরে ; তদ্দ্বারা আপনার কোনও অনিষ্টাশঙ্কা নাই।"

হাফেজ খাঁ এসব বিষয় বড় বিশ্বাস করিতেন না ; কিন্তু ফকিরের গণনার সহিত স্বীয় জীবনের ঘটনাবলীর সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন এবং কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ চিন্তাকুল ও নীরব দেখিয়া ফকির ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার আর কিছু জিজ্ঞাসা আছে?"

হাফেজ– আছে।

ফকির– কি বলুন?

হাফেজ– আপনি নবপ্রসূত শিশুর হাত দেখিয়া তাহার ভাগ্যগণনা করিতে পারেন?

ফকির– নবপ্রসূত শিশুর হাত দেখিয়া বেশ গণনা হয় না।

হাফেজ– কেন?

ফকির– তাহাদের করতলস্থ রেখাসমূহ অতিশয় অস্পষ্ট। এরূপ শিশুর ভাগ্যফল গণনা করিতে হইলে শিশুর মাতাপিতার হস্তপরীক্ষা বিশেষ আবশ্যক।

হাফেজ খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন "শিশুর মাতার হাত না দেখিয়া কেবল পিতার হাত দেখিলে গণনা হয় না?"

ফকির হাসিয়া বলিলেন "না, তা হয় না।"

হাফেজ খাঁ নিজের ও শেরিণা বিবির হাত দেখাইয়া পুত্রের ভাগ্যফল জানিবার

জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন ; কিন্তু শেরিণার সম্মতি ব্যতিরেকে ফকিরকে অন্দর মহলে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি ফকিরকে তথায় বসিতে অনুরোধ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন এবং শেরিণার নিকট ফকিরের অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে হাত দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শেরিণা বিবি প্রথমতঃ কি ভাবিয়া অসম্মত হইলেন, বলিলেন "কোথাকার কে ফকির তাহাকে অন্দরে আসিতে দেওয়া উচিত নয় ; খোদা যাহার ভাগ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চই ঘটিবে, তাহা জানিয়া রাখিবার কোনও দরকার নাই।"

হাফেজ খাঁ তনয়ের ভাগ্যলিপি জানিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। তিনি শেরিণা বিবিকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শেরিণা বিবি স্বামীর উপরোধে অবশেষে সম্মতা হইলেন। তখন হাফেজ খাঁ ফকিরকে অন্দর মহলে ডাকিয়া আনিলেন।

ফকির অন্দর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিলেন এবং কোরাণের একটি আয়েত (শ্লোক) উচ্চারণ করিতে করিতে শেরিণা বিবির সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। হাফেজ খাঁ লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু তখন ফকিরের কথা ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল। ফকির দূর হইতে অবগুণ্ঠনাবতী শেরিণা বিবির কেবল বাম করতল পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন "আপনার পত্নী পতিপ্রাণা ও সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না।"

হাফেজ খাঁ বলিলেন "এখন আমাদের উভয়ের হস্ত পরীক্ষা করিয়া এই বালকের ভাগ্যফল নির্দ্দেশ করুন।"

নবপ্রসূত শিশু মাতৃক্রোড়েই নিদ্রিত ছিল। ফকির একবার হাফেজ খাঁর একবার শেরিণার হাত দেখিতে লাগিলেন এবং পূর্ব্ববৎ মৃদু অস্পষ্ট ভাষায় কত কি বলিতে লাগিলেন ; ক্ষণকালপরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "অষ্টম দিবসের পর এই শিশুর সামান্য অসুখ হইবে।"

হাফেজ খাঁ শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইলেন, বলিলেন "ভাল করিয়া দেখুন, যদি কোনও প্রতীকার থাকে তাহাও বলুন।"

ফকির শিশুর অঙ্গপরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন হাফেজ শেরিণার ক্রোড় হইতে শিশুকে নিজক্রোড়ে ধারণ করতঃ ফকিরের নিকট বসিলেন। ফকির তাহার হস্ত, পদ, বক্ষ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "না, তত ভয়ের কারণ নাই ; সামান্য অসুস্থ হইবে মাত্র। তাহাতে প্রাণহানির কোনও আশঙ্কা নাই। তবে এক কাজ করিবেন ; নূতন চাঁদ না হওয়া পর্য্যন্ত এই শিশুকে সূতিকাগৃহের বাহির করিবেন না।"

হাফেজ খাঁ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "এ দেশে বর্গীর ভয় হইয়াছে, তজ্জন্য অদ্য আহারের পর আমরা গড়ের মধ্যে যাইব, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি।"

ফকির ললাট কুঞ্চিত ও গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বলিলেন "না না, এমন কর্ম্ম করিবেন না, আর তিন চারিদিন পরেই নূতন চাঁদ হইবে, যদি এ শিশুর মঙ্গল-কামনা করেন তাহা হইলে এই কয়দিন কদাচ স্থানান্তরিত করিবেন না।"

এই বলিয়া ফকির গাত্রোত্থান করিলেন। হাফেজ নবকুমারকে পত্নীর অঙ্কে স্থাপন করিয়া ফকিরের সঙ্গে সদর মহলে আসিলেন এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া, তাঁহাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

সমবেত মুসলমানমণ্ডলী আহারে বসিলেন। সেই নব্য ফকির কোথায় বসিলেন, হাফেজ খাঁ তাহা দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এবং ভিক্ষুক ও ফকিরগণের মধ্যে সেই ফকিরকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনেককেই তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই তাঁহার সংবাদ দিতে পারিল না। ফকির হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় হাফেজ খাঁ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বর্গীর হাঙ্গামা।

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে মহারাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহ "বর্গীর হাঙ্গামা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্গীর হাঙ্গামা বঙ্গদেশবাসী জন-সাধারণের এত আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল যে তাহারা বাসস্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যথেচ্ছা পলায়ন করিয়াছিল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় অধিপতি রঘুজী ভোঁস্‌লা চল্লিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ ভাস্কর রাওকে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। ভাস্কর রাও "ভাস্কর পণ্ডিত" বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি যখন বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন, তখন নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ উড়িষ্যা জয় করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বর্দ্ধমানের সন্নিকটে ভাস্কর পণ্ডিত নবাবকে আক্রমণ করিলেন। তখন নবাবের সঙ্গে পাঁচ সহস্র মাত্র সৈন্য ছিল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত এক কোটী টাকা ও নবাবের সমস্ত হস্তী দাবি করিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ এরূপ মানহানিকর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে নুরা-জিস্ মহম্মদ নামক জনৈক সেনাপতি দশ সহস্র সৈন্য লইয়া নবাবের সহিত মিলিত হইলেন। নবাব নববলে বলীয়ান হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। তখন তাহারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাবৃটসমাগমে তাহারা বীরভূমে আসিয়া সিউড়ির দক্ষিণ প্রান্তে "কেন্দুয়া ডাঙ্গা" নামক বিস্তৃত প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিতে লাগিল।[১]

তৎকালে একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক ফকির কেন্দুয়া ডাঙ্গাস্থিত মহারাষ্ট্রীয় শিবিরের ধার দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমন সময় জনৈক সশস্ত্র মুসলমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মুসলমান সম্মুখে ফকিরকে দেখিতে পাইয়া সসম্মানে সেলাম করিলেন। ফকিরও তাঁহাকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

মুসলমান উত্তর করিলেন "আমার নাম মীর হবিব।"

ফকির আগ্রহ সহকারে বলিলেন "আপনিই মীর হবিব?"

হবিব– হাঁ, আপনি কি আমায় জানেন?

ফকির– জানি কিন্তু চিনিতাম না। যাহা হউক, আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম, এখানে আপনারই সন্ধানে আসিয়াছি।

মীর হবিব বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন, আমার সন্ধানে কি জন্য আসিয়াছেন?"

ফকির– বিশেষ আবশ্যক আছে।

হবিব– কি বলুন?

ফকির বলিলেন "দেখুন এ দলের মধ্যে সকলেই হিন্দু, কেবল আপনিই মুসলমান। আপনি যে একাকী মুসলমান হইয়া এতগুলি হিন্দুর প্রিয় পাত্র হইয়াছেন, ইহা কম প্রশংসার কথা নহে। শুনিয়াছি, আপনি মুর্শিদাবাদে জগৎ শেঠের গৃহে দুই কোটী টাকা পাইয়াছেন, ইহাতেও আপনার খুব বাহাদুরী আছে। যাহা হউক, আপনি মুসলমান এবং আমিও মুসলমান ফকির ; আপনি যদি ভাস্কর পণ্ডিতের দ্বারা আমার একটী কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে এখানেও ঐ রকম একটা বড় ঘর আছে, দেখাইতে পারি।"

হবিব– আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে বলুন?

ফকির– আল্লার নাম লইয়া শপথ করিয়া বলুন যে আমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিবেন।

হবিব– আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার ক্ষমতায় যাহা হইবে, তাহা করিব।

ফকির– নিশ্চয়?

হবিব– নিশ্চয়।

ফকির একবার চঞ্চলনয়নে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া বলিলেন "তবে চলুন নির্জ্জনে বলিব।"

হবিব– আচ্ছা আসুন।

উভয়ে মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন। এস্থলে মীর হবিবের একটু পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মীর হবিব পূর্ব্বে উড়িষ্যার সুবাদারের কর্ম্মচারী ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ উড়িষ্যা জয় করিলে মীর হবিব তাঁহার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে নবাবের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের সংগ্রামে তিনি মহারাষ্ট্রীয় হস্তে বন্দী হন ; কিন্তু সুচতুর মীর হবিব ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনেও কর্ম্মগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় ভাস্কর পণ্ডিত তাঁহাকে মুক্তিদান করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ যখন মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন মীর হবিব পাঁচ শত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া অরক্ষিত মুর্শিদাবাদ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন এবং তত্রত্য ধনকুবের জগৎ শেঠের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটি টাকা ভাস্কর পণ্ডিতকে আনিয়া দেন। তদবধি মীর হাবিব ভাস্কর পণ্ডিতের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইলেন। বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু মীর হবিবের পরামর্শে বীরভূমে আসিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভীষণ উদ্যম।

ভাস্কর পণ্ডিত কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধৃ পরিবৃত হইয়া স্বীয় শিবির-মধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় মীর হবিব পূর্ব্বোক্ত ফকিরকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত ফকিরকে দেখিয়া মীর হবিবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে, মীর সাহেব?"

মীর হবিব বলিলেন "ইনি একজন মুসলমান ফকির, সম্প্রতি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

ভাস্কর পণ্ডিত ক্ষণকাল ফকিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আপনি এই নবীন বয়সে কি জন্য ফকিরী গ্রহণ করিয়াছেন?"

ফকির– দায়ে পড়িয়া।

ভাস্কর– এমন কি দায়ে পড়িয়াছেন যে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে ফকির হইতে হইয়াছে।

ফকির– প্রেমের দায়ে।

"প্রেমের দায়ে?"

ভাস্কর পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "প্রেমের দায়ে? কার প্রেম? ঈশ্বরের না কোনও রমণীর?"

ফকির– ঈশ্বরের প্রেম হইলে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতাম, মানবের অনুগ্রহভিখারী হইতাম না।

ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় হাসিলেন, ভাবিলেন "কি আশ্চর্য্য! সংসারে যে সকল সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বরানুরাগী অতি বিরল, নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। লোকে কোনও না কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে সংসারে বিচরণ করে।"

ভাস্কর পণ্ডিত এইরূপ চিন্তা করিয়া বলিলেন "আপনি কোন্ রূপসীর প্রেমে পড়িয়া ফকির হইয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলুন।"

ফকির– বলিবার জন্যই আসিয়াছি ; কিন্তু যদি আপনি আমায় এ দায় হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলেই বলি।

ভাস্কর– আচ্ছা আমার সাধ্যায়ত্ত হইলে ত্রুটী করিব না। এখন আপনি কে, কোথায় নিবাস এবং কি জন্যই বা ফকির হইয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলুন।

ফকির কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন "তবে শুনুন–"

শিবির-মধ্যস্থ সকলেই উৎকর্ণ হইয়া অতিশয় আগ্রহসহকারে শুনিতে লাগিলেন।

ফকির বলিলেন "আমি দিল্লীর বাদশার জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র, আমার নাম হোসেন শা।"

মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ চমকিত হইলেন, কিন্তু কেহ কিছু না বলিয়া নীরবে শুনিতে লাগিলেন।

ফকির বলিতে আরম্ভ করিলেন "প্রায় বিশ বৎসর হইল, বাদশার কন্যা আমিনার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল– সম্বন্ধ কেন, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়াছিল ; কিন্তু আমাদের প্রধান সেনাপতির পুত্র ওসমান কোনও সুযোগে ও কৌশলে বাদশা-তনয়াকে হরণ করিয়া আনিয়াছে। সে পামর আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, বাদশা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের কোনও সংবাদ পান নাই ; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানে এতদিনে আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি। দুরাত্মা সুদূর দিল্লী হইতে বাঙ্গালা মুলুকে পলাইয়া আসিয়াছে এবং "ওসমান" ও "আমিনার" পরিবর্ত্তে "হাফেজ" ও "শেরিণা" নাম ধারণ-পূর্ব্বক এখানে হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী হাতেমপুরে উভয়ে বাস করিতেছে।"

ফকির এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইলেন, শ্রোতৃবর্গও নীরব। অনন্তর ভাস্কর পণ্ডিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "উঃ! তাহারা এতদূরে আসিয়া ও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া গুপ্তভাবে বাস করিতেছে, তাহাতেও যে আপনি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন, ইহাতে আপনার খুব বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে।"

ফকির– আমি সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া তাহাদের অন্বেষণ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়াছিলাম। অগ্রে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে যদি এই তরফে আসিতাম, তাহা হইলে এত দীর্ঘকাল বিলম্ব হইত না। নাম পরিবর্ত্তন করুক আর বেশ পরিবর্ত্তন করুক, আমার চক্ষে কিছুতেই এড়াইবার যো নাই।

ভাস্কর পণ্ডিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "যদি তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাম ধারণ করিত আর বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর বেশে বাস করিত, তাহা হইলে চিনিতে পারিতেন?"

ফকির সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "মুসলমান সব পরিত্যাগ করিতে পারে কিন্তু স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না।"

ভাস্কর– আপনি এখন কি করিতে চান?

ফকির কাতরভাবে বলিলেন "দেখুন আমি পরাক্রান্ত বাদশার ভ্রাতুষ্পুত্র হইয়াও আজ ফকির– অসহায়, আর আপনি ধনজন সম্পন্ন ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, চল্লিশ হাজার লোক আপনার হুকুম তামিল করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আপনি মনে করিলেই আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন।"

ভাস্কর– আপনার প্রার্থনা কি, বুঝিতে পারিলাম না।

ফকির– আপনাকে ত সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিলাম। এখন সেই পরপত্নীহারী ওসমানের হস্ত হইতে আমার প্রাণের আমিনাকে উদ্ধার করিয়া দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ভাস্কর– আমিনা বিবি আপনার প্রাণের কি ওসমানের প্রাণের, তাহা কেমন করিয়া জানিলেন?

ফকির– আমারই আমিনা–আমারই প্রাণের আমিনা ; দেখিতেছেন না, আমি তার জন্য পাগল, তার জন্য ফকির।

ভাস্কর– আপনি তার জন্য পাগল ও ফকির হইয়াছেন তাহা বেশ বুঝিলাম ; কিন্তু আমিনা বিবি যদি আপনার প্রেমে পাগলিনী হইতেন তাহা হইলে তিনি এতদিন ওসমানের সহিত ঘরকন্না করিতেন না, আপনার মত পাগলিনী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া যেরূপেই হউক আপনার সহিত মিলিত হইতেন।

ফকির স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক বলিলেন "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমিনা আমারই ; ওসমান কেবল ছলেবলে তাহাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে।"

এমন সময় মীর হবিব বলিলেন "যদি আমার বেয়াদপি মাপ করেন, তবে একটা কথা বলি।"

ভাস্কর পণ্ডিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কি বলুন?"

হবিব– আমরা ত এখানে লোকের দাম্পত্যস্বত্ব সাব্যস্থ করিতে আসি নাই? আমাদের অত তর্ক বিতর্কে কাজ কি?

ভাস্কর– না হে তা নয়। আমি বলিতেছি যে সে আমিনা বিবি এখন অন্যের পত্নী হইয়াছেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আর কি হইবে?

হবিব– কেন?

ভাস্কর– তাঁর সঙ্গে এই ফকির সাহেবের আর বিবাহ হইবে কি?

ফকির– কেন হইবে না?

হবিব– নিশ্চয় হইবে। আপনাদের শাস্ত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ওরকম বিবাহের ব্যবস্থা আছে। পাত্রীর মাতাপিতা কিংবা অন্য অভিভাবক প্রকাশ্যভাবে যে বিবাহ দিবেন, আমাদের শাস্ত্রমতে সেই বিবাহই সিদ্ধ।

ভাস্কর পণ্ডিত হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমাদের শাস্ত্রকে সেলাম মীর সহেব। আমার মতে অন্যের উপভোগ্যা আমিনার আশা ছাড়িয়া আর একটি সুন্দরী বিবির চেষ্টা করা ভাল।"

ফকির– অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক দেখিলাম অনেক শুনিলাম, কিন্তু ওরকম সুন্দরী আর দেখিলাম না। যদি আমিনা বিবিকে না পাই, অন্য বিবির চেষ্টা করিব না, এই ফকিরের বেশে এই রূপেই দেশে দেশে ফিরিব।

ভাস্কর পণ্ডিত চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মীর হবিব বলিলেন "ইনি দিল্লীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র হইয়া যখন আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছেন, তখন আপনার সাহায্য করা উচিত।"

ফকির বলিলেন "মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমান জাতির মধ্যে চিরশত্রুতা আছে জানি ; কিন্তু সে শত্রুতা ত রাজ্য সাম্রাজ্যের জন্য? আমি রাজ্য চাই না, বাদশাহী চাই না। এই মীর সাহেব মুসলমান হইয়াও যখন আপনার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন, তখন আমি বঞ্চিত হইব, ইহা অসম্ভব।"

ভাস্কর– আপনি এই সংবাদ বাদশাকে জানাইলেন না কেন?

ফকির– দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইয়াছি এবং শীঘ্র একদল সৈন্য পাঠাইতে লিখিয়াছি ; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনও উত্তর আসিল না, কোনও সৈন্যদল আসিল না। আমি স্বয়ং দিল্লী গিয়া যথেষ্ট সৈন্য আনিতে পারি, কিন্তু আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না আমি এখানে থাকিতে থাকিতে সৈন্যাদি আসিলে উত্তম হইত। যখন তাহা হইল না, তখন অগত্যা আমাকে অন্য চেষ্টা দেখিতে হইতেছে।

ভাস্কর– এই কার্য্যের জন্য সৈন্য সামন্তের দরকার কি?

ফকির– সে পামর এখানে অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়াছে এবং হাতেমপুরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া রীতিমত সৈন্যদল রাখিয়াছে। বিনা যুদ্ধে–বিনা রক্তপাতে যে এ কার্য্য সিদ্ধ হইবে তাহা বোধ হয় না।

ভাস্কর– বীরভূমের অধিপতি রাজনগরের রাজা মুসলমান, আপনার স্বজাতি ; তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন না কেন? আপনি বাদশার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার নিকট যথেষ্ট খাতির ও সাহায্য পাইতেন।

ফকির– রাজনগরের রাজা আমাদের অধীনের অধীন, সামান্য ফকিরের মত তাঁহার দ্বারস্থ হইতে পারিলাম না। যদি আপনি সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে অগত্যা তাঁহার নিকট যাইতে হইবে।

হবিব– ফকির সাহেব যখন আপনার নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছেন, তখন আপনার বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

ভাস্কর– ওহে, সে মাছ ধরা পড়িবে না, কেবল কাদা মাখা সার হইবে।

হবিব– সে মাছটা ধরিবার ভার ফকির সাহেবের উপর থাকিল। আমরা অন্যান্য খুচরা মাছ–চুনা পুঁটি–ধরিতে পারিব না?

ফকির– জগৎ শেঠের গৃহে কেবল টাকা পাইয়াছেন ; কিন্তু তাহারা দিল্লী হইতে আসিবার সময় যে সকল মূল্যবান জহরৎ সঙ্গে আনিয়াছে, জগৎ শেঠ সে রকম জিনিস চক্ষে দেখে নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি মীর সাহেব মুর্শিদাবাদে যাহা পাইয়াছেন, সেখানে তদপেক্ষা বেশী পাইবেন।

মীর হবিব ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তা মন্দ কি?"

ভাস্কর– তোমার যদি ইচ্ছা হইয়াছে তবে চল আমার কোনও আপত্তি নাই।

ফকির– মীর সাহেব রাজি আছেন, এখন আপনার মরজি হইলেই হয়।

ভাস্কর– কখন যাইতে হইবে?

ফকির– অদ্য রাত্রিতেই গেলে ভাল হয়, নতুবা তাহারা দুর্গ-মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কঠিন হইবে। তাহারা অদ্যই দুর্গ-মধ্যে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু আমি কোনও কৌশলে তাহা বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।

এই ফকির যে সেই পূর্ব্ব বর্ণিত ভূত ভবিষ্যদ্বক্তা নব্য ফকির, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। যাহা হউক ভাস্কর পণ্ডিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মীর হবিবের অনুরোধে সম্মত হইলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় হাতেমপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। ভাস্কর পণ্ডিত, মীর হবিব ও ফকির তিন জনে সমর সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া একত্রে অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সংঘর্ষণ।

হাফেজ খাঁ ফকিরের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেদিন গড়ের মধ্যে যাইতে পারিলেন না। তজ্জন্য তিনি গড় হইতে অধিকাংশ সৈন্য আনিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে রাখিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; হাফেজ খাঁর গৃহের অন্দর মহল উচ্চ প্রাচীরদ্বয় পরিবেষ্টিত ছিল। তিনি সৈন্যগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রাচীরের বহির্ভাগে এক শ্রেণী ও ভিতরে এক শ্রেণী সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন ; সুতরাং শেষোক্ত সৈন্যগণ উভয় পার্শ্বের প্রাচীরের মধ্যস্থলে নিরাপদে স্থাপিত হইল এবং প্রাচীরের বহির্ভাগে অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্য স্থাপিত হইল। হাফেজ খাঁ বর্গীর ভয়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দ্বিতলে শয়ন করিলেন এবং শিশু সন্তানকে লইয়া শেরিণা বিবি ও ধাত্রী নীচের সূতিকাগৃহে শয়ন করিলেন।

রজনীর শেষ যামার্দ্ধ অবশিষ্ট আছে, এমন সময় ভয়ানক কোলাহলে হাফেজ খাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি গবাক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন বর্গীর দল বাড়ী ঘিরিয়াছে ও তাঁহার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। হাফেজ খাঁ যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। তিনি আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন কৃষ্ণত্রয়োদশীর ক্ষীণ চন্দ্র পূর্ব্বগগনতলে ক্ষীণালোক প্রদান করিতেছে। আর অধিক রাত্রি নাই অনুমান করিয়া হাফেজ খাঁ দ্রুতপদে নীচে নামিলেন এবং রুদ্ধশ্বাসে সূতিকাগৃহদ্বারে গিয়া ডাকিলেন "শেরিণা, শেরিণা।"

শেরিণা বিবি সুপ্তোত্থিতা হইয়া দ্বার মোচন করিলেন। ধাত্রীও জাগরিত হইল এবং তাহার অঙ্গসঞ্চালনে নব প্রসূত শিশু জাগরিত হইয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

হাফেজ খাঁ বলিলেন "শেরিণা, আর রক্ষা নাই দেখিতেছি, বর্গীর দল আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়াছে। গড়ে থাকিলে অনেকটা নিরাপদে থাকিতাম কিন্তু এই হতভাগ্য সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাতে বাধা দিল।"

শেরিণা বিবি বলিলেন "আর কত রাত্রি আছে?"

হাফেজ– বেশী না, দু'তিন দণ্ড হইবে।

শেরিণা– আমাদের সৈন্যগণ কি নিদ্রিত?

হাফেজ– না, তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কিন্তু আমাকেও প্রস্তুত হইতে হইয়াছে।

এই বলিয়া হাফেজ খাঁ পুনরায় উপর তলায় উঠিলেন এবং পূর্ব্ব দিকের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, গড় হইতে সমস্ত সৈন্যগণ বাঁধের উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তখন তিনি অসি হস্তে দ্রুতপদে নীচে আসিলেন এবং শেরিণার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "শেরিণা, প্রিয়তম, সাবধানে থাক, আমি চলিলাম। যদি বাঁচতে পারি, আবার দেখা হইবে, নতুবা এই শেষ দেখা।"

শেরিণা– তুমি একাকী যাইবে কেন, একটু অপেক্ষা কর।

হাফেজ– তুমি সদ্য-প্রসূতী না হইলে সঙ্গে লইতাম।

এমন সময় গড়ের সৈন্যগণ আসিয়া যোগদান করায় হাফেজ খাঁর সৈন্যগণ দ্বিগুণ উৎসাহিত হইল এবং ঘোররবে সিংহনাদ করিয়া উঠিল। হাফেজ খাঁ চকিত হইয়া বলিলেন "শেরিণা, ঐ শোন, কোলাহল ক্রমেই বাড়িতেছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাকে না দেখিলে সৈন্যগণ নিরুৎসাহ হইতে পারে, অতএব আমি চলিলাম।"

শেরিণা কথা কহিতে পারিলেন না, হাফেজ খাঁও আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। তিনি প্রাচীরদ্বয়ের মধ্যস্থিত সৈন্যগণের উপর অন্দররক্ষার ভার দিয়া ও কতিপয় প্রধান যোদ্ধাকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া একাকী অসিহস্তে বহির্গত হইলেন।

দ্বারমুক্ত হইবামাত্র মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধাগণ গৃহপ্রবেশের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু হাফেজ খাঁ বহির্গত হইবা মাত্র তন্মুহূর্ত্তে দ্বার রুদ্ধ হইল। বীরপুঙ্গব হাফেজ খাঁ মহারাষ্ট্রীয় ব্যূহ ভেদ করতঃ নক্ষত্রবেগে স্বীয় সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া মারহাট্টাগণ চমকিত হইল। হাফেজ খাঁ নিজের আগমনবার্ত্তা স্বকীয় সৈন্যগণের গোচর করিবার জন্য হুঙ্কার ছাড়িলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সৈন্যগণ অতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইল এবং ঘন ঘন সিংহনাদে নৈশগগন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। ভীষণ কোলাহলে, অসির ঝন্‌ঝনায় ও বর্ষার ঘাত প্রতিঘাত শব্দে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল। হাতেমপুরের কৃষিজীবি নিরীহ অধিবাসিগণ অকালে প্রলয় জ্ঞান করিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হাফেজ খাঁর সৈন্যসংখ্যা অল্প ; কিন্তু তাহাদের অদ্ভুত রণকৌশল দেখিয়া মারহাট্টাগণ যুগপৎ বিস্মিত ও ভীত হইল। তাহারা অনেক স্থলে অনেক যুদ্ধ করিয়াছে, নবাবের সুশিক্ষিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু এরূপ তেজস্বিতা ও এরূপ নির্ভীকতা আর কুত্রাপি নয়নগোচর করে নাই। সুতরাং তাহারা আক্রমণ করিতে আসিয়া এখন প্রকারান্তরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল এবং পরিশেষে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে লগিল।

সে ফকির এখন আর ফকির নাই, নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লেলিহান শার্দ্দূলের ন্যায় কেবল হাফেজ খাঁর অনুসন্ধনে প্রবৃত্ত। তিনি দূর হইতে হাফেজ খাঁকে দেখিতে পাইয়া ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হাফেজ খাঁও

অসিহস্তে তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন। দুই জনের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসিযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ হইলে হাফেজ খাঁ বিস্মিত হইলেন। তিনি প্রতি যোদ্ধাকে মারহাট্টা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বীরবরের মুখের পানে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়াও বেশ বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় পূর্ব্বগগন ঊষার আরক্তিমরাগে রঞ্জিত হইল এবং দেখিতে দেখিতে ধরাতল দিবালোকে আলোকিত হইল। তখন হাফেজ খাঁ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হোসেন শা বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং এই আকস্মিক আক্রমণের কারণ বুঝিতে পারিলেন। একবার মাত্র তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই রোষে ও জিঘাংসায় চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণায়মান হইল। তিনি দন্তে অধর দংশন করতঃ দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ করিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

হোসেন শারও হৃদয়ের অন্তঃস্থল প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। যে ধূমায়মানবহ্নি–যে অন্তর্নিহিত রোষাগ্নি এতদিন তাঁহার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছিল, আজ যেন তাহা প্রচণ্ড বাত্যাবিক্ষুব্ধ দাবানলের ন্যায় ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মূর্ত্তিমান ক্রোধের ন্যায় হাফেজ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই বীরদ্বয়ের অপূর্ব্ব সমরাভিনয় দেখিয়া ভাস্কর পণ্ডিত ও মীর হবিব স্তম্ভিত হইলেন এবং মারহাট্টাগণ হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

নৈশান্ধকার অপসারিত ও দিবালোক সমাগত দেখিয়া শেরিণা বিবি যুদ্ধদর্শনাভিলাষিণী হইয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলেন এবং পূর্ব্ব পার্শ্বের বাতায়ন ঈষদুন্মুক্ত করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে নহে ; বীরাঙ্গনা শেরিণা ভয় কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। তবে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হোসেনকে হাফেজ খাঁর সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া শেরিণার সংজ্ঞালোপ হইবার উপক্রম হইল।

শেরিণা ভাবিলেন "কি সর্ব্বনাশ! হোসেন কোথা হইতে সহসা এখানে আসিল?"

শেরিণা প্রথমতঃ নিজের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে বিবেচনা করিলেন ; কিন্তু কম্পিত-করে গবাক্ষদ্বার আরও উদঘাটিত করিয়া দেখিলেন, সত্য সত্যই হোসেন। যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, যাঁহার জন্য তাঁহারা দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া এতদূরে পলাইয়া আসিয়াছেন, এ সেই হোসন।

এদিকে হাফেজ খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমপদাঘাতে হোসেনকে ধরাশায়ী করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে ছেদন করিবার জন্য স্থিরলক্ষ্যে যেমন তরবারি উত্তোলন করিলেন, তন্মুহূর্ত্তে মীর হবিব সুযোগ বুঝিয়া বর্শাঘাতে হাফেজ খাঁর অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিলে হাফেজের অসি আর নিপতিত হইল না। তিনি ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় সহসা ভূপতিত হইলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার প্রাণবায়ু পার্থিব বায়ুর সহিত মিশিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বীরঙ্গনা।

হাফেজ খাঁকে পতিত দেখিয়া তাঁহার সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যম হইল এবং ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মীর হবিব হোসেনকে লইয়া স্থানান্তরে গমন করতঃ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইত্যবসরে মারহাট্টাগণ দ্বারদেশে একত্র হইয়া অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ ঝন্ ঝন্ শব্দে লৌহকপাট উন্মুক্ত হইল। অমনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তেজস্বিনী শেরিণা বিবি অসিহস্তে বহির্গত হইলেন। তদ্দর্শনে মারহাট্টাগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অনিমিষ-লোচনে চাহিয়া রহিল। বীরাঙ্গনা শেরিণা বিবি বিদ্যুদ্বেগে মহারাষ্ট্রীয় বাহিনী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সম্মুখে যাহাকে পাইলেন তাহারই মস্তক ছেদন করিলেন। অসংবৃতবসনা আলুলায়িতকুন্তলা রণোন্মত্তা রমণীকে রণস্থলে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ ভাবিল, বুঝি দানব দলনী ভবানী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিলেন, তাঁহার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইল। তিনি কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইয়া যুগ্মকরে বলিলেন "মা! তুমি কে? ক্ষান্ত হও মা, আমরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসি নাই।"

পতিবিয়োগবিধুরা শেরিণার বাহ্যজ্ঞান নাই, দৃক্‌পাত নাই, ঘন ঘন অসিচালনা করিতে করিতে ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে ধাবিতা হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিত ক্ষিপ্রহস্তে কটিবিলম্বিত অসি কোষোন্মুক্ত করিলেন ; কিন্তু প্রাণভয়ে হউক অথবা স্ত্রীহত্যার ভয়েই হউক পণ্ডিতজী কি ভাবিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। তদ্দর্শনে ব্যাঘ্রী-বিতাড়িত মেষপালের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

আততায়িগণকে পলায়নপর দেখিয়া শেরিণা বিবি ভূপতিত হাফেজ খাঁর সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহার ধূলিধূসরিত নিষ্প্রভ বদনমণ্ডলের প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসা অবধি আজ পর্যন্ত—এই সুদীর্ঘ কালের অতীত ঘটনাবলী ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে হইতে লগিল। অবলা দুর্দ্দমনীয় শোকাবেগ আর সংবরণ করিতে পারিলেন না, দর দর ধারায় অশ্রু বিগলিত হইয়া তাঁহার গোলাপ বিনিন্দিত গণ্ডদ্বয় প্লাবিত করিল। অবশেষে তিনি একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বামীর মৃতদেহ তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং ত্বরিতপদে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহদ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হাফেজ খাঁর ভীষণ পদপ্রহারে হোসেন শা ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলে মীর হবিব তাঁহাকে লইয়া কিছু দূরে গিয়াছিলেন। তৎপরে যখন শেরিণা বিবির ভয়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ পলায়ন-পূর্ব্বক মীর হবিবের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন হোসেন শা চৈতন্য লাভ করিয়াছেন। ভাস্কর পণ্ডিত বলিলেন "মীর সাহেব! আমার কথা সত্য হইল কি না? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে মাছ ধরা পড়িবে না, কেবল কাদা মাখা সার হইবে। তুমি গুপ্তাঘাতে হাফেজ খাঁকে হত্যা করিলে, নতুবা আজ ফকির সাহেবের প্রাণটি যাইত। লাভের মধ্যে সেইটি বাকী আছে, এখন চল।"

মীর হবিব অপ্রতিভ হইয়া নীরবে রহিলেন। হোসেন শা বলিলেন "যখন দুরাত্মা হাফেজ খাঁ নিহত হইয়াছে, তখন আমার শেরিণা লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। সে স্ত্রীলোক বই ত নয়, কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে?"

ভাস্কর পণ্ডিত বলিলেন "আপনি ভুল বুঝিয়াছেন ; শেরিণা বিবির দেহে প্রাণ থাকিতে, আপনি তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবেন না।"

উভয়ের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় কিছু দূরে বিস্তর সৈন্য দেখিতে পাওয়া গেল। সমরক্লিষ্ট মারহাট্টাগণ ভয়চকিতনেত্রে দেখিতে পাইল, প্রবল বন্যার ন্যায় মুসলমান সৈন্যগণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে। তখন তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গন্তব্য পথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিল। ভাস্কর পণ্ডিত ও মীর হবিব স্বীয় সৈন্যগণের অনুসরণ করিলেন, এক মাত্র হোসেন শা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হঠাৎ একজন অপরিচিত সশস্ত্র যুবক আসিয়া হোসেন শার হস্ত ধারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এ বর্গীর দলে আপনি কে? আপনাকে মুসলমান বলিয়া বোধ হইতেছে।"

হোসেন শা সংক্ষেপে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন "আপনি কে? এবং এই সব কাহার সৈন্য?"

যুবক বলিলেন "আমি রাজনগরাধিপতি বদিওজ্জমান খাঁর দ্বিতীয় পুত্র, আমার নাম মহম্মদ আলিনকি খাঁ। আপনি হাফেজ খাঁ ও শেরিণা বিবির বিষয় দিল্লীশ্বরের গোচর করিলে বাদশা মুর্শিদাবাদের নবাবকে সৈন্য-সাহায্য করিবার আদেশ দেন ; কিন্তু নবাব সাহেব বর্গীর হাঙ্গামায় বিব্রত থাকায় মুর্শিদাবাদ হইতে সৈন্য পাঠাইতে না পারিয়া আমাদের উপর এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বর্গীদিগকে বীরভূম হতে বিতাড়িত করিবার জন্য আমাদের নিকট সৈন্য-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা গতকল্য নবাবের আদেশ-লিপি পাইয়াছি। বর্গীর দল কেন্দুয়ার ডাঙ্গায় ছাউনি করিয়াছে শুনিয়া আমরা সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তাহাদিগকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া, হাফেজ খাঁর বিরুদ্ধে আসিয়াছি। আপনি বর্গীদের সঙ্গে এখানে কিরূপে আসিলেন?"

হোসেন শা বলিলেন "আমি হাফেজ খাঁর সন্ধান পাইয়া দিল্লীতে বাদশার নিকট সংবাদ পাঠাইলাম এবং দুর্দ্ধর্ষ হাফেজকে সহজে ধৃত করিতে পারা যাইবে না বিবেচনা করিয়া কিছু সৈন্য পাঠাইতে লিখিলাম ; কিন্তু বাদশার নিকট হইতে কোনও সংবাদ না আসায় আমি হতাশ হইয়া ভাস্কর পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি এখানে সসৈন্য আসিয়া হাফেজ খাঁকে নিহত করিলেন। কিন্তু আপনাদিগকে নবাব-সৈন্য ভাবিয়া পলায়ন করিলেন। যাহা হউক, আপনারা উপযুক্ত সময়ে আসিয়া পড়িয়াছেন। হাফেজ খাঁ নিহত হইয়াছে, তাহার সৈন্যগণও পলায়ন করিয়াছে, শেরিণা এখন সহজেই হস্তগত হইবে।"

এমন সময় স্বয়ং রাজা বদিওজ্জমান খাঁ, তাঁহার ভ্রাতা আজিম খাঁ, রাজপুত্র আসদজ্জমান খাঁ, আজিম খাঁর পুত্র বরকৎ খাঁ এবং বাঙ্গালী সেনাপতি বাঁকা দ্বীপচাঁদ সরকার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া হাফেজ খাঁর গৃহাভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করিলেন।[১]

একে সাত দিনের প্রসূতি, তাহার উপর রণশ্রম, অবলার প্রাণে আর কত সহিবে? শেরিণা বিবি একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং দারুণ পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া অপরিমিত জল পান করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল ও ক্ষণকাল পরে দুঃসহ অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাত দিনের শিশুকে ধাত্রীর ক্রোড় হইতে লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। ভাবিলেন, নবনীলাঞ্ছিত সুকোমল পুত্রগাত্রসংস্পর্শে অন্তর্দাহ অন্তর্হিত হইবে ; কিন্তু তাহা হইল না, প্রিয়তম হাফেজের রুধিরাপ্লুত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

এমন সময়ে বহির্দ্দেশে পুনরায় সৈন্য-কোলাহল উত্থিত হইল। তখন শেরিণা বিবি শিশুপুত্রকে ধাত্রীর ক্রোড়ে রাখিয়া ছাদে উঠিলেন. দেখিলেন বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনরায় গৃহবেষ্টন করিয়াছে। এই সৈন্যগণকে মুসলমান বলিয়া বোধ হওয়ায় শেরিণা প্রথমতঃ আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। তাহারা কাহার সৈন্য ও কোথা হইতে আসিল, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। পরে সৈন্যগণের মধ্যে হোসেনকে দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। তিনি অনুমান করিলেন যে হোসেন শা দিল্লী হইতে সসৈন্য আসিয়াছেন এবং এতক্ষণ স্বকীয় সৈন্যগণকে গুপ্তভাবে রখিয়াছিলেন ; বর্গীরা পলায়ন করায় তাহাদিগকে লইয়া আসিলেন।

ইত্যবসরে রাজনগরের সৈন্যগণ দ্বারভগ্ন করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। তথায় যে সকল সৈন্য ছিল তাহারা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া পরাভব স্বীকার করিল। ধাত্রী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ে শেরিণার নিকট পলায়ন করিলে, শেরিণা ধাত্রীকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই শিশুকে কোনও উপায়ে রক্ষা করিতে পারিবে?"

ধাত্রীর মুখে বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সে যে কি উত্তর দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না, নির্ব্বাক নিস্পন্দ কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তদ্দর্শনে শেরিণা বিবি

দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন "পারিবে না, তবে দাও, আমার হৃদয়ের ধন আমার হৃদয়েই থাকিবে।" এই বলিয়া তিনি শিশুপুত্রকে ধাত্রীর ক্রোড় হইতে টানিয়া লইয়া স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিলেন।

হোসনে শা অন্দরে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি দূর হইতে শেরিণা বিবিকে ছাদের উপর দণ্ডায়মানা দেখিয়া দ্রুতপদে তথায় উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ধাত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

শেরিণা গম্ভীরভাবে বলিলেন "আচ্ছা হোসেন? আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে এরূপে আজ আমার সর্ব্বনাশ করিলে?"

হোসেন শা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি তোমার কি দোষ করিয়াছিলাম, যে আমায় ফাঁকি দিয়া পলাইয়া আসিয়াছ? যাহার সঙ্গে আসিয়াছিলে, সে এখন কোথায়? এইবার তোমার রক্ষা করুক।"

এই বলিয়া হোসেন শা শেরিণাকে ধরিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন, তখন শেরিণা অবজ্ঞাসূচক হাসি হাসিয়া বলিলেন "যাহার সঙ্গে আসিয়াছি, তাহারই সঙ্গে যাইব।"

এই বলিয়া শেরিণা শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়াই ছাদ হইতে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক একবারে প্রাঙ্গণস্থিত পুষ্করিণীর জলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমকিত হইল। হোসেন ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং রাজা বদিওজ্জমান খাঁর নিকটবর্ত্তী হইয়া ম্লানমুখে বলিলেন "আমার আশা ফুরাইল, আপনার কর্ত্তব্যও ফুরাইল। আপনি এখন স্বস্থানে প্রস্থান করুন, কিন্তু আমি আর গৃহে ফিরিব না, আর দিল্লী যাইব না। এই বলিয়া হোসেন শা হতাশ হৃদয়ে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।[২]

রাজা বদিওজ্জমান খাঁ, হফেজ খাঁর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে ও হাতেমপুরবাসী প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া মৃতের সৎকার করিবার আদেশ করিলেন। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া সলিল হইতে শেরিণা বিবির ও নবজাত শিশুর মৃতদেহ উত্তোলন করিল এবং হাফেজ খাঁর শব লইয়া এক স্থানেই তিনজনকে সমাহিত করিল।[৩]

শব সমাহিত করিবার অব্যবহিত পরেই সহসা এক ফকির তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি সমাধিপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন এবং সমাধিগাত্রে অঙ্গুলি দ্বারা পারস্যভাষায় [ফারসি] একটি কবিতা লিখিলেন। সেই কবিতাটির বাঙ্গলা অর্থ এই–

তৈলবিনা দীপশিখা জলে নাহি জ্বলে,
বরং নির্ব্বাণ হয় পরশিলে নীর,
যেই মূঢ় চায় দীপ জ্বালিবারে জলে,
(এই) ফকিরের মত দীপ তার বিফল ফিকির।

এই কবিতাটি লিখিয়া ফকির প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর রাজা বদিওজ্জমান খাঁ শেরিণা বিবির সমাধি ইষ্টক নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং জনৈক মুসলমানকে কিছু ভূসম্পত্তি দিয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে হেতমপুরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে হাফেজ খাঁর বাড়ীর যে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহার অনতিদূরেই শেরিণা বিবির সমাধি-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ এখনও সেই সমাধি-মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে শব সমাহিত করেন, এখনও প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তথায় আলোক প্রদান করিয়া বীরঙ্গনা শেরিণা বিবির অসাধারণ বীরত্বের সম্মানরক্ষা করেন এবং এখনও মহম্মদীয় পর্ব্ব-বিশেষে সম্রাট-তনয়া শেরিণা বিবির আত্মার কল্যাণ কামনায় নামাজ পড়েন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ক্রমোন্নতি।

হাফেজ খাঁর মৃত্যুর পর হাতেমপুর গ্রাম ও হাফেজ খাঁর দুর্গ রাজনগরাধিপতির অধিকারভুক্ত হইল। তিনি মহারাষ্ট্রীয় বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্গে কিছু সৈন্য রাখিলেন। তাঁহার পুত্র আলিনকি খাঁ ও আসদজ্জমান খাঁ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বরকৎ খাঁ কিছুদিন তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা সাহেব তাঁহাদিগকে দুর্গ-মধ্যে বাস করিবার অনুমতি দিলেন এবং বাঙ্গালী সেনাপতি বাঁকা দ্বীপচাঁদ সরকারের হস্তে দুর্গরক্ষার ভারার্পণ করিয়া রাজনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাজকুমার আলিনকি খাঁ দুর্গের পশ্চিম প্রান্তে একটি বাগান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করাইলেন ; লোকে উহাকে "আলির বাগান" বলিত।[১] আমরা এই বাগানের চরমাবস্থা দেখিয়াছি, এক্ষণ আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই। কিছুদিন পরে আলিনকি খাঁ পিতৃআজ্ঞাক্রমে রাজনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

হাতেমপুরের উত্তরাংশের ঈষদুন্নত ভূভাগ এতদিন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। আসদজ্জমান খাঁ ও বরকৎ খাঁ তাহা পরিষ্কার করাইয়া দুইটি নূতন পল্লী স্থাপন করিলেন। আসদ খাঁর নামানুসারে একটি পল্লীর নাম "আসদগঞ্জ" ও বরকৎ খাঁর নামানুসারে অপরটির নাম "বরকতিপুর" হইল।[২] তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় এই পল্লীদ্বয় ক্রমশঃ বহুলোকের আবাসভূমি হইল। আসদগঞ্জে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, গোপ, সদ্গোপ, ময়রা, মুদি, সূত্রধর, তন্তুবায়, ধীবর প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোক আসিয়া স্ব স্ব জাতীয় ব্যবসায় আরম্ভ করিল এবং বরকতিপুরে প্রধানতঃ সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় সোণারূপার কারবার করিতে লাগিল। এই নবস্থাপিত পল্লীদ্বয়ের অধিবাসিসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায় কালক্রমে দুইটি মিশিয়া এক হইল। বরকতিপুরের পশ্চিমোত্তরপ্রান্তে কয়েক ঘর ধুনুরি আসিয়া বাস করিল, তাহারা তুলা ধুনিত।[৩] ইলামবাজার হইতে কয়েক ঘর নড়ি আসিয়া তথায় বাস করিল এবং গালা ও আলতার ব্যবসায় আরম্ভ করিল। পরে কয়েক ঘর কলু আসিয়া নড়িদের সঙ্গে সেই স্থানে বাস করিল। এইরূপে, দেখিতে দেখিতে সেই স্থানটিও একটি ক্ষুদ্র পল্লীর আকার ধারণ করিল। ধুনুরিদের প্রথম বাসস্থান বলিয়া লোকে উহাকে "ধুনুরিয়া পাড়া" বলিত ; কিন্তু কালক্রমে উক্ত নাম রূপান্তরিত হইয়া 'ধামুড়িয়া' নামে পরিণত হইয়াছে।

আসদ খাঁর প্রযত্নে এই পল্লীত্রয়ের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলসমূহ পরিষ্কৃত হইয়া ক্রমশঃ আবাদী জমিতে পরিণত হইল। আসদ খাঁ এই সমস্ত জমির বন্দোবস্ত করিবার জন্য পিতৃসকাশে অনুমতি চাহিলেন এবং কয়েকজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী পাঠাইতে লিখিলেন। রাজা সাহেব কয়েকজন কর্ম্মচারিসহ সীতারাম ঘোষ নামক জনৈক দেওয়ানকে প্রেরণ করিলেন। সীতারাম উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন এবং হাতেম খাঁর অবসর গ্রহণের পর তিনি রাজা সাহেবের রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সীতারামের সঙ্গে আরও কতকগুলি কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ আমিন, কেহ মুহুরী, কেহ বা অন্যান্য কার্য্য করিতেন। আসদ খাঁর আদেশ অনুসারে সীতারাম ঘোষ প্রথমতঃ আমিন দ্বারা হাতেমপুর, আসদগঞ্জ, বরকতিপুর ও ধামুড়িয়া— এই পল্লীচতুষ্টয়ের বাস্তু, উদ্বাস্তু, পতিত, আবাদী সর্ব্ববিধ ভূমির পরিমাপ করিলেন। পরিমাপ শেষ ও পরিমাণ স্থিরীকৃত হইলে প্রজাগণের অধিকার অনুযায়ী জমিজমার পত্তন করিলেন। উল্লিখিত পল্লীচতুষ্টয়ের লাখেরাজ ব্যতীত মালের সমস্ত ভূমির জমাবন্দী হইল এবং হাতেমপুর ভিন্ন অপর পল্লীত্রয়ের বাস্তু ও উদ্বাস্তুর জমা ধার্য্য হইল। হাতেম খাঁ হাতেমপুরবাসী কোনও প্রজার নিকট বাস্তুর কর গ্রহণ করেন নাই, সহৃদয় আসদ খাঁও সেই বন্দোবস্ত কায়েম রাখিয়া মহাত্মা হাতেম খাঁর সম্মান রক্ষা করিলেন।[৪]

এই বন্দোবস্ত উপলক্ষে সীতারাম ঘোষকে হাতেমপুরে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার অধীন কায়স্থ কর্ম্মচারিগণ গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে কয়েকখানি কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতেন। উল্লিখিত পল্লীচতুষ্টয়ের বন্দোবস্তকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে রাজকুমার আসদ খাঁ সীতারাম ঘোষের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পারিতোষিক প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখন সীতারাম বলিলেন "আপনাদের কার্য্য করিতে করিতে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলাম, এইবার আমাকে অবসর প্রদান করুন। এই স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর ; আমার ইচ্ছা, এইখানে বাস করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন অতিবাহিত করি।"

আসদ খাঁ বলিলেন "আপনার মত বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে অবসর দিলে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি। যাহা হউক তদ্বিষয়ে আমার কোনও হাত নাই ; তবে আপনি প্রার্থনা করিলে তাহা মঞ্জুর-জন্য রাজা সাহেবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইলাম। আপাততঃ আপনি আমার নিকট কিরূপ পুরস্কার লইবেন বলুন। আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।"

এ কালের লোক হইলে সীতারাম ঘোষ এই সুযোগে কোনও মূল্যবান ভূসম্পত্তি অথবা প্রভূত অর্থ লাভ করিতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি সেকালের সেই সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে সম্পত্তি ও অর্থ অনিত্য ও অনর্থের মূল, এ বৃদ্ধ বয়সে আর সে ঝঞ্ঝাট কেন? তিনি অনুচরবর্গ লইয়া যে স্থানে বাস করিতেছিলেন, সেই স্থানটি প্রার্থনা করিলেন।

তখন সদাশয় আসদ খাঁ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "এই সামান্য ভূমি লইয়া কি করিবেন? ইহাতে আপনার সন্তোষবিধান হইতে পারে, কিন্তু আমার তৃপ্তিলাভ হইল না। যাহা হউক, আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনি অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক যতখানি স্থান পরিবেষ্টন করিতে পারিবেন, তাহা আপনাকে লাখেরাজ স্বরূপ প্রদান করিব।"

বৃদ্ধ সীতারাম ঘোষ তাঁহার অনুগত কায়স্থ কর্ম্মচারিগণকে লইয়া যে স্থলে বাস করিতেন সেই স্থানটি ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অল্পপরিমিত পতিত ভূমি অশ্বারোহণে পরিবেষ্টন করিয়া আসিলেন। আসদ খাঁর আদেশ অনুসারে তৎক্ষণাৎ অশ্বের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানের পরিমাপ হইল এবং তাহা সীতারামকে লাখেরাজ প্রদত্ত হইল। অতঃপর সীতারাম ঘোষ তথায় স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়গণকে আনয়ন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানকালে সেই ক্ষুদ্রায়ত স্থানটি কায়স্থগণের আবাসভূমি এবং সীতারাম ঘোষের নামানুসারে "সীতারামপুর" নামে অভিহিত। এই সীতারামপুর দোয়েম খালাসী লাখেরাজ স্বত্বে কায়স্থগণ এখনও পর্য্যন্ত ভোগ-দখল করিতেছেন।[৫]

সীতারামপুরে সীতারাম ঘোষ সপরিবারে স্থায়িভাবে বাস করিলে দুর্গস্থিত সেনাপতি বাঁকা দ্বীপচাঁদ সরকার তথায় সপরিবারে বাস করিতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্ব হইতে সীতারামের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। দ্বীপচাঁদ রাজনগরের অন্তর্গত রাধানগরে বাস করিতেন, তাঁহার প্রকৃত নাম রূপচাঁদ দাস।[৬] তিনিও উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন এবং রাজ সরকারে হইতে "বাঁকা দ্বীপচাঁদ সরকার" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা সাহেব তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে তিনি স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সীতারামপুরে বাস করিতে লাগিলেন, রাধানগরে তিনি যে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের সেবা প্রকাশ করিয়া ছিলেন তাহা গুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজা সাহেব তাঁহাকে এখানে চল্লিশ বিঘা লাখেরাজ জমি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা বাঁকা দ্বীপচাঁদের প্রপৌত্র গঙ্গানারায়ণ সরকারকে সেই নিষ্কর জমির অর্দ্ধাংশ (কুড়ি বিঘা) ভোগ-দখল করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার অবর্ত্তমানে তদীয় একমাত্র উত্তরাধিকারিনী কন্যা সৌদামিনী কিছুদিন উহা ভোগদখল করিয়াছিলেন। সৌদামিনীর পরলোক প্রাপ্তির পর তদীয় পুত্রদ্বয় (হরিদাস মজুমদার ও যতীন্দ্রমোহন মজুমদার) এখন উহা ভোগ-দখল করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সন ১১৬৪ সালের ২৫শে ফাল্গুন তারিখের এই লাখেরাজ জমির সনন্দ রহিয়াছে।[৭]

বর্ত্তমান কালে সীতারাম ঘোষের বংশধর কেহ নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সীতারামপুরে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন তাহা এখনও "ঘোষের পুকুর" বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পরিবর্ত্তন।

রাজনগরাধিপতি রাজা বদিওজ্জমান খাঁ পরিণত বয়সে ধর্ম্মচর্চ্চায় অত্যন্ত মনোনিবেশ করিলেন।[১] এক ফকির কোরাণ পাঠ করিতেন, রাজা সাহেব শ্রবণ করিতেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁহার মন ধর্ম্মালোচনায় এরূপ নিবিষ্ট হইল যে তিনি রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়া অহোরাত্র কেবল কোরাণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাজকার্য্যের নানাবিধ অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। রাজপুত্র আলিনকি খাঁ বিরক্ত হইয়া ফকিরকে হত্যা করিলেন ; কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল, তিনি রাজা সাহেবের বিরাগভাজন হইলেন। তেজস্বী আলিনকি খাঁ রাজনগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন এবং নবাবের অধীনে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

ফকির নিহত হইল কিন্তু রাজা সাহেবের মনের গতি ফিরিল না। তিনি একাকী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে কেবল কোরাণ পাঠ করিতে লাগিলেন, ভ্রমেও বিষয়-ব্যাপারের চিন্তা করিতেন না। আলিনকি খাঁ এই সমস্ত ব্যাপার নবাবকে জানাইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা আসদজ্জমান খাঁকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অনুমতি পাইলেন। আসদ খাঁ তখন হাতেমপুর দুর্গে বাস করিতেছিলেন। আলিনকি খাঁ রাজনগরে আসিয়া হাতেমপুর দুর্গ হইতে আসদকে আনয়ন-পূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন [১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দ] এবং পুনরায় মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করিলেন, কেবল সেনাপতি বাঁকা দ্বীপচাঁদ সরকার সীতারামপুরে থাকিয়া দুর্গের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই সময় হাতেমপুর দুর্গের বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নবাবের যে সমস্ত সৈন্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিল, তাহারা জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বীরভূমে প্রেরিত হইয়াছিল। আসদজ্জামান খাঁ তাহাদিগকে হাতেমপুর দুর্গে রাখিয়াছিলেন। এতদঞ্চলের জলবায়ু চিরদিন স্বাস্থ্যের অনুকূল সুতরাং পীড়িত সৈন্যগণ অচিরে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিল।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের নবাব হইলেন। তাঁহার কোনও একটি অপমানসূচক কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া আলিনকি খাঁ নবাব-দরবার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাজনগরে আসিলেন এবং নবাবের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে আলিনকি খাঁ বীরভূমে

একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে এই বিরোধ মিটিয়া যাওয়ায় আলিনকি খাঁ পুনরায় নবাবের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন।[২]

এই ঘটনার অল্পদিন পরে, ইংরাজগণের সহিত সিরাজদ্দৌলার বিরোধ সংঘটিত হইল এবং ইংরাজগণ পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। তাঁহাদের নিয়োগ অনুসারে সিরাজের সৈনাপতি মীর জাফরআলি মুর্শিদাবাদের নবাব হইলেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইলে আসদজ্জমান খাঁ মীর জাফরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময় নবাব পুত্রশোকে এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন ; কিন্তু আসদ তাহাতে সম্মত না হইয়া ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইলেন। তখন মীর জাফরের পত্নী মণি বেগম ইংরাজগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজগণ আসদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজনগর ও হাতেমপুর দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে রাজনগর দুর্গের প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁ ও হাতেমপুর দুর্গের সেনাপতি বাঁকা দ্বীপচাঁদ সরকার নিহত হইলেন। তখন আসদজ্জমান খাঁ ইংরাজগণের সহিত সন্ধি করিলেন ; কিন্তু এই যুদ্ধের পর, হাতেমপুর দুর্গ ক্রমশঃ ভগ্ন ও ধ্বংস হইয়া গেল।[৩]

সীতারাম ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থগণ হাতেমপুরের সর্ব্বপ্রথম ভদ্র অধিবাসী। তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় তথায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বাস করেন। প্রথমে যে ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন তিনি গঙ্গোপাধ্যায় উপাধিধারী ; কিন্তু তাঁহার কি নাম এবং কোথা হইতে আসিয়া এখানে বাস-স্থাপন করিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না।[৪] উক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় রাজনগরাধিপতির নিকট অনেক লাখেরাজ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোপাল বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তিনি যে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন তাহা এখনও "গাঙ্গুলী পুকুর" বলিয়া অভিহিত হইতেছে। এই গাঙ্গুলী মহাশয় কর্ত্তৃক ক্রমশঃ মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়ঠাকুর প্রভৃতি বিবিধ বংশীয় ব্রাহ্মণগণ আনীত হইলেন। কিছুদিন পরে হাতেমপুরে ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অধিক হইল যে জনশূন্য ভূভাগ এই দুই পল্লীকে পৃথক রাখিয়াছিল, তাহা কেবল ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি হইয়া উল্লিখিত পল্লীদ্বয়কে একত্রীভূত করিয়া ফেলিল। এইরূপে লোকসংখ্যা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় হাতেমপুর, আসদগঞ্জ, বরকতিপুর, ধামুড়িয়া ও সীতারামপুর— এই পঞ্চপল্লী পরস্পর সংমিলিত হইয়া একটি বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইল এবং সর্ব্বপ্রথমে হাতেমপুর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া সমগ্র গ্রামখানি সাধারণতঃ হাতেমপুর বা হেতমপুর নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

কালক্রমে গাঙ্গুলি-বংশীয়েরা হীনাবস্থাপন্ন হইলে ভুই উপাধিধারী জনৈক তাম্বুলী অত্যন্ত ধনবান হইয়া উঠিলেন।[৫] শুনিতে পাওয়া যায়, বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি এখানে যে একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন, তাহা এখনও "ভুই পুকুর" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে।[৬]

এই দুই বংশ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে রায় পরিবার অত্যন্ত ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। এই বংশের মাগারাম রায় রাজনগরের মুসলমান রাজার অধীনে তহশীলদারী ও ইজারাদারী প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।[৭] তিনি অতি সৎকর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র অনন্তলাল রায় প্রতি বৎসর বহুব্যয়ে জগদ্ধাত্রীদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন।[৮] এই পূজা উপলক্ষে দুই তিন দিন নৃত্যগীত প্রভৃতি উৎসব ও অসংখ্য ব্রাহ্মণ-ভোজন হইত এবং বিস্তর দীন দুঃখী ও ইতর লোক পানভোজনে পরিতৃপ্ত হইত। অনন্তলাল আত্মপর ভেদশূন্য ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং সকলের প্রতি সমান প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিতেন।

পরদুঃখকাতরতা রায় বংশের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা বিপদে সম্পদে সকলের সাহায্য করিতেন এবং শারীরিক ক্লেশে কাতর না হইয়া বরং পরোপকারজনিত বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। অন্নদানের জন্য রায় বংশের বিশেষ সুখ্যাতি অদ্যাপি লোকমুখে বিঘোষিত হয়। কিন্তু কালের কুটিলগতি-প্রভাবে রায় বংশের সেই সৌভাগ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। বর্ত্তমানকালে সে অন্নদান নাই, বরং বর্ত্তমান বংশধরগণ অন্নাভাবগ্রস্ত। যে গৃহ একদিন মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতির আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল, আজি তাহা হতাশহৃদয়ের তপ্তশ্বাসসন্তপ্ত। সে সুখোচ্ছ্বাসপূর্ণ গৃহ নীরব ও নিরানন্দময়। সেই জগদ্ধাত্রী পূজার ধূমধাম কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, যেন দেবী রায় পরিবারের প্রতি বিমুখ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থাপন করিয়াছেন।

এইরূপে রায় বংশের অধঃস্তন পুরুষগণ ক্রমশঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক সামান্য ব্রাহ্মণতনয় এই রায় বংশের সাহায্যে মুসলমান রাজসরকারের বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া হেতমপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর এই রাজবংশের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

হেতমপুর-কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আদি বিবরণ।

হেতমপুর রাজবংশ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, শুদ্ধ শ্রোত্রীয়, কণ্বালের সন্তান। শিমুলনাই গাঁই, বাৎস্য গোত্র।[১] আদি পুরুষের নাম মুরলীধর চক্রবর্ত্তী। মুরলীধরের জন্মস্থান ও পৈত্রিক আবাসভূমি বাঁকুড়া। তিনি ১০৫৭ সালে [১৬৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দ] অতি অল্প বয়সে চাকুরির জন্য বীরভূমে আগমন করেন এবং রাজনগরের অধিপতি বাহাদুর খাঁ ওরফে রণমস্ত [রণমস্ত] খাঁর রাজসংসারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া রাজনগরে সপরিবারে বাস করিতেন এবং পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত "দধিবামন" নামক কুলদেবতাকে কর্ম্মস্থানে আনয়ন-পূর্ব্বক বিহিত সেবা পরিচর্য্যা করিতেন। তিনি সাধারণ গৃহস্থ সন্তান ছিলেন এবং চৈতন্যচরণ ও প্রসাদ নামক দুই পুত্র রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। এতদ্ব্যতীত মুরলীধরের সাংসারিক জীবনের আর কোনও বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না, জানিবার উপায়ও নাই।[২]

মুরলীধরের দুই পুত্র– চৈতন্যচরণ ও প্রসাদ। চৈতন্যচরণ ১১০৬ সালে [১৬৯৯-১৭০০ খ্রিস্টাব্দ] ও প্রসাদ ১১১০ সালে [১৭০৩-১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ] জন্মগ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, চৈতন্যচরণ সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া মুসলমান রাজকর্ম্মচারিগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সঙ্গীতানুরাগী হাফেজ খাঁর অনুরোধে রাজনগর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হেতমপুরে আসিয়া বাসস্থাপনা করিয়াছিলেন। যতদিন হাফেজ খাঁ জীবিত ছিলেন, ততদিন চৈতন্যচরণের কোনও কষ্ট ছিল না ; কিন্তু হাফেজ খাঁর উৎসাদনের পর হইতে চৈতন্যচরণ ক্রমশঃ দারিদ্র্য দশায় পতিত হইলেন।

কালক্রমে চৈতন্যচরণের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল– ব্রজমোহন, রাধানাথ ও কুচিল।[৩] চৈতন্যচরণ ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিয়া সামান্য আয়ে অতি কষ্টে পুত্রগণকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসাদ হেতমপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁপানগরী গ্রামে একটী পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের কার্য্য করিতেন এবং শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে বাঙ্গলা লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। পাঠশালারও অতি সামান্য আয় ছিল সুতরাং সংসারে তাঁহাদের অভাব মোচন হইত না।

চৈতন্যচরণ দরিদ্র হইলেও অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সঙ্গীতরসে নিমগ্ন থাকিতেন, সংসারিক ক্লেশকে অন্তরে বড় স্থান দিতেন না। বিশেষতঃ সঙ্গীত

বিদ্যার এমনি অদ্ভুত মহিমা যিনি এ রসে সুরসিক, তাঁহার হৃদয়ে দুঃখ বড় স্থান পায় না। কিন্তু চৈতন্যচরণের এই সামান্য সুখেও বিধাতা বাদ সাধিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রজমোহন অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দারিদ্র্যপীড়িত চৈতন্যচরণ পরিণত বয়সে পুত্রশোকরূপ ভীষণ শেলাঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না ; ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ও শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িল এবং ১১৮১ সালের [১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ] প্রারম্ভে তিনি মহাকালের শান্তিময় ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইয়া শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইল।[৪] প্রসাদ চক্রবর্ত্তী বরাবর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একান্নবর্ত্তী ছিলেন। অগ্রজের পরলোকপ্রাপ্তির পর বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও পিতৃহীন শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ভরণপোষণের ভার তাঁহারই স্কন্ধে পতিত হইল।[৫]

চৈতন্যচরণের মৃত্যুর সময় তদীয় পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। ১১৮১ সালের শেষভাগে [১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ] তিনি একটি পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রের নাম সনাতন। ইহার অল্পদিন পরেই প্রসাদেরও একটি পুত্র হইল, তাঁহার নাম নফরচন্দ্র।

দরিদ্রের বংশবৃদ্ধি বিড়ম্বনা মাত্র। প্রসাদ পাঠশালার সামান্য আয়ে অতি কষ্টে শিশুপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগুলিকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন এ গুরুভার বহন করিতে হইল না। ১১৮২ সালের শেষভাগে [১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দ], একটি অনাথ পরিবারকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া তিনিও ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণের প্রতিপালনের ভার অগত্যা জননীর উপর পতিত হইল। গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও সংস্থান নাই, অথচ গৃহে তিন চারিটি ক্ষুধার্ত্ত শিশু, বিধবা ব্রাহ্মণ পত্নীদ্বয় বিষম বিপদে পড়িলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে জনৈক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর গৃহে কার্য্য করিয়া শিশু সন্তানগুলির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

জননীর ঈদৃশ ক্লেশ দেখিয়া বালক রাধানাথের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল এবং তাঁহার কোমল হৃদয়ে মাতৃদুঃখবিমোচনের কঠোর সংকল্প সমুদিত হইল। বিদ্যার্থী রাধানাথ তখন বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিলেন এবং গ্রাম্য পাঠশালায় যে সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হইলেন।[৬]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ।

রাধানাথ চক্রবর্ত্তী চৈতন্যচরণের দ্বিতীয় পুত্র। ১১৬৮ সালে [১৭৬১-৬২ খ্রিস্টাব্দ] তাঁহার জন্ম হয় এবং পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর ছিল।

এই সময় হেতমপুরে রায় পরিবারের পূর্ণ অভ্যুদয়। তাঁহারা রাজনগরের মুসলমান রাজার অধীনে অনেক লাট তালুকের পত্তনি ইজারা আদি বন্দোবস্ত লইয়া অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু ও ধনাঢ্য হইয়াছিলেন।[১] বালক রাধানাথ তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া জমিদারী সেরেস্তায় কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহাদের বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইলেন। রাধানাথের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া ও তাঁহার বিনয় নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উদারস্বভাব রায় বংশীয়েরা কিছুদিন পরে তাঁহাকে আদায় তহশীলের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

রাধানাথ পিতৃব্যের নিকট গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য মাত্র বাঙ্গলা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্বীয় প্রতিভা বলে অচিরে জমিদারী সেরেস্তার কার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন এবং ক্রমশঃ প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।[২] তিনি উপার্জ্জনক্ষম হইয়া অবিলম্বে দুঃখিনী জননীর দুঃখমোচনে কৃতকার্য্য হইলেন।

এই সময় রাধানাথের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি বীরভূম জেলান্তর্গত পেরুয়া গ্রাম নিবাসী নিকুঞ্জনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা দাশুমণি দেবীর পাণি-গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি কুচিলের বিবাহ দেন ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বলরাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১১৯১ সালে [১৭৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দ] অতি অল্প বয়সেই সনাতনের মৃত্যু হইল। তাঁহার জননীও পুত্রশোকে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া অচিরে সনাতনের পশ্চাদ্‌গমন করিলেন।[৩]

কালক্রমে রাধানাথ চক্রবর্ত্তী রাজনগরের মুসলমান রাজার অধীনে কয়েকটি মহালের ইজারা বন্দোবস্ত লইয়া যথেষ্ট লাভবান হইলেন। এতদ্ভিন্ন রাধানাথকে বিচক্ষণ ও কার্য্যকুশলী জানিয়া রাজনগরাধিপতি বাহাদুরজমান খাঁ সময়ে সময়ে তাঁহার উপর অনেক গুরুতর কার্য্যের ভারার্পণ করিতেন ; তাহাতেও রাধানাথ যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেন।[৪]

একদা বাহাদুরজমান খাঁ কোনও কারণে কুপিত হইয়া রাধানাথকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কতিপয় বরকন্দাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৫] তখন রাধানাথের পত্নী দাশুমণি পূর্ণগর্ভা। রাধানাথ এই সংবাদ পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নানাস্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আসন্নপ্রসবা পত্নীও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। এইরূপ দুঃসময়ে (১১৯৩ সালে) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপ্রচরণের জন্ম হয়। কথিত আছে, একদা হেতমপুরস্থ ব্রাহ্মণীয়া নামক এক ক্ষুদ্র সরসীর বিমলতটে তৃণাচ্ছাদিত স্থানে সদ্যজাত শিশু সূর্য্যোত্তাপে শায়িত আছে, এমন সময় এক প্রকাণ্ড বিষধর তথায় আসিয়া শিশুর মস্তকোপরি ফণাবিস্তার করতঃ তাহার বদনমণ্ডল ছায়াবৃত করিল।[৬]

জনকজননী ও অন্যান্য অনেকেই এই বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শিশু বিপ্রচরণের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য কল্পনা করিলেন। কার্য্যে তাহাই হইয়াছিল। বীরবর সের শা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুনের পলায়িত ও লুক্কায়িত অবস্থায় যেমন মহামতি আকবর শা জন্মগ্রহণ করিয়া উত্তরকালে দিল্লীশ্বর পদবাচ্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ বিপ্রচরণও রাধানাথের পলায়িত ও লুক্কায়িত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

গ্রহ সুপ্রসন্ন হইল। রাজনগরাধিপতি অচিরে রাধানাথের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বিপ্রচরণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথের বিষয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাধানাথ ১২০৫ সালে ধন্যা ও জোনেদপুর ক্রয় করিলেন। আবার তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে ১২০৭ সালে লাট রূপসপুর ক্রয় করিলেন।[৬] এইরূপ ক্রয় বিক্রয় আদান-প্রদান প্রভৃতি বিবিধ কৌশলে ১২০৮ সালের মধ্যে তিনি হালশীনগর, গোপালনগর ও কুণ্ডহিত এই তিন পরগণার জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়া বীরভূম অঞ্চলে একজন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত জমিদার মধ্যে পরিগণিত হইলেন।[৭]

১২১০ সালে রাধানাথ রাধাবল্লভ জীউর সেবা প্রকাশ করিলেন এবং ঠাকুর বাড়ীর সংলগ্ন সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মিত হইল।[৮] তদবধি এই ব্রাহ্মণ পল্লীর নাম "রাধাবল্লভপুর" হইয়াছে।[৯]

যে বৎসর রাধাবল্লভবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন সেই বৎসরে অর্থাৎ ১২১০ সালে [১৮০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দ], রাধানাথের সুখের সংসারে এক অশান্তি দেখা দিল,– ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিষম মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাই [কুচিল] এই অশান্তির মূলীভূত কারণ, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দোহাই দিয়া মফঃস্বলের কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিতেন। রাধানাথ ইহা অবগত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। কুচিল চক্রবর্ত্তী অগ্রজের তিরস্কারে ক্রুদ্ধ হইয়া ১২১০ সালের ১০ই আশ্বিন [সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দ] তারিখে একত্রাবস্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পৃথক হইলেন। রাধানাথও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুর্ব্ব্যবহারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়া তাঁহাকে

বিষয়ের কোনও অংশ দিলেন না, বরং তাঁহার নামে টাকা আত্মসাৎ করণাপরাধে বীরভূমের দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।[৭] এই অভিযোগের বিচার হইবার পূর্ব্বে কুচিল সমুদয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তির জন্য ১২১১ সালে ১৬ আষাঢ় [জুন-জুলাই ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ] তারিখে ৭৮৩৩ টাকা ১২ আনা ২ পাই দাবিতে নালিশ করিলেন।[৭] তাহাতে রাধানাথ এইরূপ মর্ম্মে জবাব দেন যে এই সম্পত্তি তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ও তাহাতে কুচিলের কোনও স্বত্ব নাই।[৬]

যাহা হউক বীরভূমের জজ সাহেব বাহাদুর এই মোকদ্দমার বিচার করিয়া এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ষোল আনা সম্পত্তির রকম নয় আনা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুচিল চক্রবর্ত্তী সাত আনা অংশ পাইবেন। রাধানাথ চক্রবর্ত্তী এই আদেশের বিরুদ্ধে মুর্শিদাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিলেন।[৮] আপীল আদালত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চোদ্দ আনা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুই আনা অংশ প্রাপ্তির আদেশ দিলেন।

এখন কুচিল চক্রবর্ত্তী অর্দ্ধাংশ প্রাপ্তির আশায় একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। নিম্ন আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি যে সাত আনা অংশ পাইবার আশা করিয়াছিলেন সে আশাও ফুরাইল। তিনি অনেক চেষ্টায় ও উদ্যোগে এই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিলেন। পুনর্ব্বিচারে বিচারপতি এইরূপ মীমাংসা করিলেন যে ভ্রাতৃদ্বয় একান্নবর্ত্তী হিন্দুপরিবারভুক্ত থাকিয়া সমস্ত সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, এই কারণে উভয়েই সম অংশ পাইবার হকদার ; কিন্তু বিষয়ের তত্ত্বাবধান, উন্নতি সাধন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে কনিষ্ঠ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারই কৃতিত্ব অধিক। এইরূপ সাব্যস্থ করিয়া তিনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন ও আদেশ দিলেন যে ষোল আনা সম্পত্তির মধ্যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা এগারো আনা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাঁচ আনা অংশ পাইবেন। অতঃপর আর কোনও পক্ষ কোনও আপত্তি উত্থাপন করিলেন না, ডিক্রীর আদেশানুসারে উভয় ভ্রাতাই সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেন।

সম্পত্তি বন্টন ও বিভাগের সময় ঠাকুর ও ঠাকুরবাড়ী লইয়া বিরোধ হইয়াছিল। কুচিল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরবাড়ীর অংশের দাবি করিলেন কিন্তু ঠাকুরসেবা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে রাধানাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন যে তিনি তাঁহাকে প্রহার করিয়া সে স্থান হইতে দূর করিয়া দেন। পরিশেষে উহা কোনওরূপে আপোসে নিষ্পত্তি হইয়াছিল। কুচিল ঠাকুর সেবা লইতে অসম্মত হওয়ায় ঠাকুরবাড়ীরও অংশে পাইলেন না।

এইরূপে এই বংশে "এগার আনি বা বড় তরফ" ও "পাঁচ আনি বা ছোট তরফ"– এই দুইটি শাখার উৎপত্তি হইল। কোনও সমৃদ্ধিশালী বংশ দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হইলে তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই বিদ্বেষভাব লক্ষিত হয়। উল্লিখিত দুই "তরফের" মধ্যে বহুকাল যাবৎ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে ছোট তরফের বংশধরগণ বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া অনেকেই

অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং বড় তরফের বংশধরগণ দিন দিন বর্দ্ধিতশ্রী হইয়া উঠিলেন ; সুতরাং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেই বিদ্বেষভাব এখন তিরোহিত হইয়াছে।

এই এগার আনি বা বড় তরফ হইতে বর্ত্তমান রাজবংশের উৎপত্তি। অতএব আমরা অগ্রে এই রাজবংশের বর্ণনা করিয়া পরে ছোট তরফের বিষয় বলিব। বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, রাজনগরের অধিপতিগণ নানা কারণে ঋণজালে জড়িত হইয়া ক্রমশঃ হীনাবস্থায় পতিত হইলেন এবং দেনার দায়ে তাঁহাদের বহু মূল্যের সম্পত্তিসমূহ অল্পমূল্যে নীলামে বিক্রীত হইতে লাগিল। এই সময় সুযোগ পাইয়া রাধানাথ অনেক সম্পত্তি ক্রয় করিলেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে কিছু দিন ক্রোক আমীনের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১২১৬ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ [নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ] তারিখে তিনি রাজনগরের রাজবাড়ীতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে গিয়া গৃহপ্রবেশের চেষ্টা করেন কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান দ্বার রক্ষকগণ তাঁহার গতিরোধ করে। তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া মুর্শিদাবাদের কলেক্টার সাহেবের নিকট ১২১৬ সালে ১৩ই পৌষ তারিখে এক রিপোর্ট করেন[ছ] এবং অবশেষে পুলিশ প্রহরীর সাহায্যে সম্পত্তি ক্রোক করেন।[জ] রাধানাথ কতদিন ক্রোক আমীনের কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না ; তবে শুনিতে পাওয়া যায় যে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই যথেষ্ট সম্পত্তিশালী হইয়া চাকুরী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে বিষয় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ১২১৭ সালে তিনি যশপুরের তালুকদার সেখ রেজারবক্তের নিকট চক্ মোহনপুর খরিদ করেন ও অন্যান্য সম্পত্তির অনেক উন্নতি সাধন করেন। মোহনপুরে তিনি একটি বাঁধ খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

রাধানাথের দুই পুত্র ও চারি কন্যা ছিল। পুত্রদ্বয়ের নাম বিপ্রচরণ ও গঙ্গানারায়ণ এবং কন্যাগণের নাম রুক্মিণী, কৃষ্ণমণি, শ্যামমণি ও রামমণি। বিপ্রচরণ ১১৯৩ সালে ও গঙ্গানারায়ণ ১২০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

১২৪০ সালে গঙ্গানারায়ণ দুর্গোৎসব এবং বিপ্রচরণ সরস্বতী পূজা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেই বৎসর চৈত্র মাসে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়। পর বৎসর রাধানাথ আর গৃহে দুর্গা পূজা করিতে পারিলেন না ; হেতমপুর নিবাসী গয়ারাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উপর দুর্গোৎসবের ভারার্পণ করিলেন। গয়ারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বংশধরগণ অদ্যাপি এই পূজা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।[ঝ] পূজার ব্যয় রাজষ্টেট হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বীরভূম জেলান্তর্গত কান্দিঘি গ্রামে মজুমদার বংশে গঙ্গানারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার কোনও সন্তান আদি জন্মে নাই।[১০] গঙ্গানারায়ণ অতিশয় আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং তিনি যে কয়দিন এ সংসারে বর্ত্তমান ছিলেন সে কয়দিন আমোদ আহ্লাদেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রুক্মিণী দেবী ১২০৫ সালের ৯ই শ্রাবণ জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত সাজিনা গ্রামনিবাসী কুলীনশ্রেষ্ঠ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বারকানাথ বাবু মুন্সেফের পদে কার্য্য করিতেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর অপত্যহীন রুক্মিণী দেবী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থপর্যটন, ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি সৎকর্ম্মে বৈধব্যজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পিতৃপ্রদত্ত সম্পত্তি ব্যতীত রাজষ্টেট হইতে তাঁহার যথেষ্ট বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তিসমূহ বর্ত্তমান রাজষ্টেট ভুক্ত হইয়াছে। তৎ প্রতিষ্ঠিত দুর্গোৎসব এক্ষণ রাজব্যয়ে সম্পন্ন হইতেছে। ১২৮৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে রুক্মিণী দেবী মৃত্যু হয়।

১২১৮ সালে রামমণির জন্ম হয়। বালিজুড়ি গ্রাম নিবাসী শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহারা হেতমপুরেই বাস করিতেন। রাধানাথ তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত সম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে রামমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি হেতমপুরে বাস করিতেছেন এবং সেই সমস্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন।[ঞ]

কৃষ্ণমণি ১২২২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিপুরনিবাসী কুলীনপ্রবর পণ্ডিত ও জজ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্যের পুত্র আনন্দমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত কৃষ্ণমণির বিবাহ হয়।[১১] কৃষ্ণমণিও হেতমপুরে বাস করিতেন এবং পিতার নিকট অনেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৬০ সালে কৃষ্ণমণির মৃত্যু হয়। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি হেতমপুরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ ভোগ করিতেছেন।[ঞঞ]

রাধানাথের অপর কন্যা শ্যামমণির শৈশবে অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হয়। তাঁহার জন্ম মৃত্যুর সময় পাওয়া যায় না।

১২৪০ সালে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হইলে রাধানাথ বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন এবং বৈষয়িক ব্যাপারে বীতস্পৃহ হইয়া উপযুক্ত জেষ্ঠ্য পুত্র বিপ্রচরণের উপর যাবতীয় সংসারের গুরুভার অর্পণ-পূর্ব্বক ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সুযোগ্য পুত্র বিপ্রচরণও পিতৃ-আদেশানুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রাধানাথ এইরূপে বিবিধ সদনুষ্ঠানে রত থাকিয়া ১২৪২ সালে [১৮৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দ] মানবলীলা সংবরণ করেন। আমরা এস্থলে আরও দুই একটি কথা বলিয়া মহাত্মা রাধানাথের জীবনীর উপসংহার করিব।

রাধানাথ চক্রবর্ত্তী হেতমপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই মহাত্মার জীবনী আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। শৈশবাবধি সংসারসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালায় আজীবন সন্তরণ করিয়া তিনি স্বকীয় ক্ষমতা বলে যেরূপ উন্নতিমার্গে বিচরণ করিয়াছিলেন, সুখাভস্ত্য ও সযত্নপালিত হইলে কখনই তাহা পারিতেন না। ফলতঃ মঙ্গলময় বিধাতার বিধি বিধান বাহ্যদৃষ্টিতে যতই কঠোর বোধ

হউক না কেন, তাহার অভ্যন্তরে মহামঙ্গলের বীজ নিহিত থাকে। তাহা না হইলে, কে জানিত যে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয়ের পর্ণকুটীরে আজ গগনস্পর্শী সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী উত্থিত হইবে? সকলই সেই লীলাময় ভগবানের লীলা! নচেৎ আজি কেহ সেই রাধানাথকে স্মরণ করিত কি না সন্দেহ। হয় ত– হয় ত কেন, নিশ্চয়ই–তাঁহার নাম পর্য্যন্ত আজ বিস্মৃতি সাগরে বিলীন হইত।

রাধানাথ চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকালে প্রায় বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান।[১২] হেতমপুরে তাঁহার অনেক সৎকীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। হেতমপুরের পশ্চিম প্রান্তে তিনি একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি "চক্রবর্ত্তী পুষ্করিণী বা বাঁধাপুকুর" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাঁধাপুকুরের জল স্রোতস্বতীজলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ। বাঁধাপুকুরে সর্ব্ব সাধারণের স্নানাবগাহন নিষিদ্ধ, কেবল পানীয় সংগ্রহার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সুতরাং কোনওরূপে দূষিত হয় না।[১৩]

বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও ধর্ম্মকর্ম্মে রাধানাথের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। পূর্ব্ব-পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত দধিবামন নামক কুলদেবতার সেবা পরিচর্য্যা ব্যতীত তিনি গৃহে যে রাধাবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন অদ্যাবধি তাঁহার নিয়মিত পূজার্চ্চনা হইতেছে। লক্ষ হরিনাম জপ রাধানাথের দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং তিনি নিজে অনেক কীর্ত্তনের গান রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত "প্রার্থনা" নামক একটি গান এ স্থলে লিপিবদ্ধ হইল :–

(প্রার্থনা)

এস রাধানাথ হৃদি-পদ্ম-কাননে।
অনেক দিনের সাধ আছে হেরব নয়নে।।
পরি' এস পীতধরা মস্তকেতে মোহন চূড়া
গুঞ্জবেড়া–
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে কিশোরী বামে
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
মনোহর–
তুলসী মঞ্জরী দিব যুগল চরণে।।[১৪]

ক. এই ঘটনাটি কাল্পনিক বা অলীক নহে। ১৯০০ সালের জুলাই মাসের "ন্যাশনেল ম্যাগেজিন" পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল[১৫] :–

"Tradition says that while the infant [Bipracharan] lay on the grassy plot, a huge cobra came out of a hole and slowly creeping to the place was seem to spread his hood over the child for protecting it from the rays of the sun. The mother and others noticed the remarkable incident. It was in their judgment an auspecious omea [omen] indicating the child's future greatnees & c."

খ. বর্ত্তমান রাজষ্টেটের কার্য্যালয় "রাধাবল্লভপুর কাছারী" নামে প্রচলিত।

গ. ১৮০৪ সালের ২৩৫৫৩ নং মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল হেতমপুর রাজষ্টেটের মহাফেজখানায় পাওয়া গিয়াছে।

ঘ. ১৮০৪ সালের ২৩৬৫৪ নং মোকদ্দমা।

ঙ. এই জবাবের একখানি প্রতিলিপি হেতমপুর রাজষ্টেটের মহাফেজখানায় পাওয়া গিয়াছে।

চ. মুর্শিদাবাদ প্রবিন্স্যাল কোর্টের ১৮০৭ সালের ৯নং আপীল। ইহারও ডিক্রীর নকল উল্লিখিত দপ্তরখানায় পাওয়া গিয়াছে।

ছ. এই রিপোর্টের নকল বর্ত্তমান রাজষ্টেটের দপ্তরখানায় পাওয়া গিয়াছে।

জ. আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঝ. তাঁহার পুত্র কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঞ. কৃষ্ণমণির পুত্র প্রতাপ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তস্য পুত্র সুরথচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন।[১৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপ্রচরণ।

মহাত্মা রাধানাথের পরলোকগমনের পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিপ্রচরণ বাবু তদীয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। পিতার মৃত্যুর সময় বিপ্রচরণ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

বিপ্রচরণ পিতৃশ্রাদ্ধে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন এবং বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাযোগ্য সম্মান সহকারে অন্ন বস্ত্র ও অর্থ প্রভৃতির দ্বারা সৎকৃত হইয়াছিলেন এবং মহাসমারোহে কাঙ্গালী-ভোজন হইয়াছিল। এই শ্রাদ্ধব্যাপারে এত অধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল যে রাশিকৃত অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করা দুঃসাধ্য হওয়ায় অবশেষে শকট-সাহায্যে উহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং মণ্ড ধারণের জন্য যে খাল খনিত হইয়াছিল, তাহা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছিল।

রাধানাথের মৃত্যুর পর শত্রুগণ ও পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণ বিপ্রচরণ বাবুকে বিপন্ন করিবার জন্য নানারূপ ষড়যন্ত্র ও কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। মামলা মোকদ্দমা দ্বারা তাঁহাকে বিব্রত করিতেও অনেকেই চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে সম্পত্তিসমূহ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং নিজেও উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন। বহুবিস্তৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে বিব্রত হওয়া দূরের কথা, তিনি স্বল্পকাল-মধ্যে যেরূপ শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে বিপক্ষগণের কূটবুদ্ধি ব্যর্থ ও কুটিল কৌশলজাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

বিপ্রচরণ বাবুর কার্য্যপ্রণালী অতি সুন্দর ছিল। তিনি নিজের মহালগুলি বৎসরান্তে এক একবার পরিদর্শন করিতেন এবং প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেন। নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ প্রজাগণের উপর কোনওরূপ অত্যাচার করিতেছে কি না, তাহারা রীতিমত কার্য্য করিতেছে কি না, তাহা গোপনে সংবাদ লইতেন এবং তদনুযায়ী প্রতিকার করিতেন। প্রজাগণও তাঁহার গুণে মুগ্ধ ও একান্ত বশীভূত ছিল। খাজনা আদায়-জন্য তাঁহাকে প্রায়ই আইন আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত না, সহজেই ও নির্ব্বিরোধে সুসম্পন্ন হইত। কোনও নূতন মহাল ক্রয় করিলে সর্ব্বাগ্রে তিনি তাহা জরীপ করাইতেন এবং বৎসরান্তে চিঠা মিল করিতেন। নূতন মহালে সকল কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিতেন, জঙ্গল ও ডাঙ্গা ভাঙ্গিয়া বাগান,

পুষ্করিণী ও আবাদী জমি প্রস্তুত করাইতেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে এবং প্রজাগণের মঙ্গলকর কার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন।

বিপ্রচরণ বাবুর গুণগ্রামে সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। বীরভূমের তদানীন্তন জজ ডালবার [ডানবার] বেলি সাহেব বাহাদুর বিপ্রচরণ বাবুকে এত ভালবাসিতেন যে তিনি বিদায়কালে (১৮১৯ সালের ৫ই জুন তারিখে) তাঁহাকে সিউড়ির "বড় বাগান" নামক উদ্যান ও "লালকুঠী" নামক বাড়ী উপহার দিয়া যান।[১] বিপ্রচরণ বাবুর বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যকৌশল দেখিয়া রাজনগরাধিপতি দাওরজমান খাঁ সাহেব তাঁহাকে স্বীয় রাজষ্টেটের দেওয়ানী [দেওয়ান] পদে নিযুক্ত করেন। বিপ্রচরণ বাবু ১২৪৪ হইতে ১২৪৯ সাল পর্য্যন্ত অতীব প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রাজা দাওরজমান খাঁ তাঁহার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক "হুজুর" উপাধি প্রদান করেন।[২] তদবধি সকলেই তাঁহাকে "কর্ত্তা হুজুর" বলিত।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত বাঘ-ডহরী গ্রামনিবাসী শ্রীনাথ চৌধুরীর ভগিনীর সহিত বিপ্রচরণ বাবুর বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু বিবাহের দুই বৎসর পরেই পত্নীবিয়োগ হইলে তিনি পুনরায় বীরভূম জেলান্তর্গত বেড়েলা গ্রামের বক্‌শী বংশোদ্ভবা মন্দাকিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মন্দাকিনী দেবীই বর্ত্তমান রাজা বাহাদুরের পিতামহী এবং "কর্ত্রীঠাকুরাণী" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

বিপ্রচরণ বাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম প্রমথনাথ, আশুতোষ ও কৃষ্ণচন্দ্র এবং কন্যাদ্বয়ের নাম দোলগোবিন্দমণি ও কৃষ্ণবিনোদিনী। ১২৩০ সালে প্রমথনাথ, ১২৩২ সালে আশুতোষ এবং ১২৩৩ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়।

প্রমথনাথ একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে তাঁহার উপনয়নের দিন স্থির হইল, এমন সময় তিনি হঠাৎ ডিপ্‌থিরিয়া রোগাক্রান্ত হইয়া (১২৪০ সালে) মৃত্যুমুখে পতিত হন। নবম বর্ষীয় বালক আশুতোষও (১২৪১ সালে) অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। জনক জননী শোকের উপর শোক, ব্যথার উপর ব্যথা পাইয়া যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন।

এক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র বংশধর রহিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র একবিংশতিবর্ষে পদার্পণ করিলে বিপ্রচরণ বাবু মহাসমারোহে পুত্রের বিবাহ দিলেন। বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত সর্পী গ্রামের কৈলাশচন্দ্র রায় চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শিবসুন্দরীর সহিত ১২৫৪ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ হয়। এই দম্পতিযুগল বর্ত্তমান রাজাবাহাদুরের জনক-জননী।

বিপ্রচরণ বাবু দুহিতৃদ্বয়কেও যথাকালে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ময়নাপুর নিবাসী খ্যাতনামা দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায়ের পুত্রদ্বয় (কুলদানন্দ ও তারকানন্দ)[৪] তাঁহার জামাতা ছিলেন। বংশানুগত রীতি অনুসারে দুহিতৃদ্বয় পিত্রালয়ে না থাকিলেও বিপ্রচরণ তাঁহাদিগকে সম্পত্তি ও বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। বিপ্রচরণের যত্নে ও চেষ্টায় কুলদানন্দ বাবু মুন্সেফী পদপ্রাপ্ত হইয়া পরে সবজজের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং তারকানন্দ গবর্ণমেন্ট পুলিশ বিভাগে ইনস্পেক্টার হইয়াছিলেন। কুলদানন্দ বাবুর বর্ত্তমান বংশধরগণ[৪] এখন বীরভূমের সদর ষ্টেশন সিউড়ি নগরীতে বাস করতঃ বিপ্রচরণ প্রদত্ত সম্পত্তিসমূহ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত "কালীবাড়ী" সর্ব্বত্র পরিচিত। বিপ্রচরণ বাবু কুলদানন্দ বাবুকে সিউড়ির বড়বাগান প্রদান করেন ও একটি মনোহর প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া দেন।

পুত্রের পরিণয়োৎসব সম্পন্ন করিয়া বিপ্রচরণ বাবু সেই বৎসর ফাল্গুন মাসে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। নারায়ণপুর নিবাসী বৈদ্য বংশোদ্ভব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট চন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের পিতা নরহরি গুপ্ত তৎকালে গয়াধামে চাকরী উপলক্ষে বাস করিতেন। বিপ্রচরণ বাবু গয়াধামে গমন করিলে তিনি তাঁহার অত্যন্ত যত্ন লইয়াছিলেন তজ্জন্য বিপ্রচরণ বাবু গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে একটি নিষ্কর বাগান উপহার দিয়াছিলেন।

বিপ্রচরণ বাবু রাজনগরের রাজবংশসম্ভূতা বিবি রজবন্নেসাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করিয়া তপ্পে মহাম্মদাবাদের জমিদারী স্বত্ব আবদ্ধ লইয়াছিলেন এবং ১২৫০ সালের ১৪ই বৈশাখ তারিখে স্বীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের নামে উক্ত মহাম্মদাবাদ পত্তনি লইয়াছিলেন।[৩] বিবি রজবন্নেসা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে না পারায়, তিনি ১২৫৪ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কেন্দুলী নিবাসী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের বিনামে আরও পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পণ দিয়া মহাম্মদাবাদের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। এই পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার দ্বিগুণ আয়বৃদ্ধি হয়। অতঃপর তিনি লাট শা-আলমপুরের চতুর্থাংশ পত্তনি স্বত্বে বন্দোবস্ত লইয়া অবশেষে তাহার ষোল আনা জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেন। এই সমস্ত সম্পত্তিতে তাঁহার লক্ষাধিক টাকা আয়বৃদ্ধি হইয়াছিল।[৪]

সন ১২৫৮ সালে [১৮৫১-৫২ খ্রিস্টাব্দ] বিপ্রচরণ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া সাংঘাতিক পীড়িত হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞানুসারে "জ্ঞানগঙ্গার" উদ্যোগ করিলেন (অর্থাৎ জ্ঞান থাকিতে থাকিতে গঙ্গাতীরস্থ করিলেন)। গঙ্গাতীরবর্ত্তী কাটোয়ায় কিছু দিন অবস্থিতির পর বিপ্রচরণের পীড়ার উপশম হইল এবং তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হেতমপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হেতমপুরবাসিগণ তাঁহাকে নিরাময় দেহে প্রত্যাগত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল।

কাটোয়ায় ভাড়ার বাড়ীতে অবস্থানকালে তাঁহাদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য বিপ্রচরণ তথায় একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে কৃষ্ণচন্দ্র তথায় একটি দ্বিতল অট্টলিকা নির্ম্মাণ করাইলেন। ১২৬০ সালের

১২ অগ্রহায়ণ এই গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া ১২৬১ সালের বৈশাখ মাসে সমাপ্ত হইয়াছিল।[৫]

সন ১২৬২ সালের শ্রাবণ মাসে সাঁওতাল পরগণায় ভয়ঙ্কর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তত্রত্য বাঙ্গালী মহাজনগণ নানারূপ প্রবঞ্চনা প্রতারণা করিয়া নিরীহ সাঁওতালজাতির যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করিত। মিষ্ট কুলের আঁটিও গিলিতে হইবে এমত নহে, তাহা এক সময় না এক সময় গলায় লাগিয়া প্রাণান্ত করিয়া ফেলে। মহাজনদের অবস্থাও তদ্রূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল।[৬] নিরীহ সাঁওতালজাতি তাহাদের অত্যাচারে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া পরিশেষে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং বাঙ্গালী দেখিবামাত্র হত্যা করিতে লাগিল। এই দেশব্যাপী বিদ্রোহানলের দিক্‌দাহী শিখা বীরভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, লোকে ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল। সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে বিশেষরূপে যত্নবান হইলেন এবং জার্ভিস[৭] নামক জনৈক কাপ্তেনের অধীনে কতিপয় গোরা ও সিপাহী প্রেরণ করিলেন।

উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদী, পূর্ব্বে কেন্দুলী, পশ্চিমে দিগুলি ও দক্ষিণে হরিপুর গ্রাম--এই চতুঃসীমা মধ্যে একটী বিস্তৃত প্রান্তরে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত সাঁওতালগণের যুদ্ধ হইয়াছিল[৭] এবং সাঁওতালগণ পরাস্ত হইয়া পার্ব্বত্যপথে পলায়ন করিয়াছিল। এই বিপ্লবের সময় বিপ্রচরণ বাবু ইংরাজ সৈন্যগণের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রসদ আদি সরবরাহ করিয়াছিলেন। ১২৬২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ তারিখে [নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ] ছোটলাট বাহাদুর পরগণা মহাম্মদাবাদ অন্তর্গত বিলকান্দী গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করেন। বিপ্রচরণ বাবু তথায় গিয়া ছোটলাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ নিবারণ বিষয়ে অনেক সুপরামর্শ দেন।[৭]

১২৬৪ সালের কার্ত্তিক মাসে বিপ্রচরণ বাবু পুনরায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। এইবার তাঁহার পীড়া কালস্বরূপ হইল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে আর নিস্তার নাই। তখন তিনি পুনরায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইতে ইচ্ছা করিলেন। তদনুসারে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কাটোয়ায় লইয়া যান। যাইবার সময় হেতমপুরবাসিগণ ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিল যে তিনি যেমন প্রথমবার পীড়িত হইয়া সুরধুনীতীরে গিয়া আরোগ্য লাভ করতঃ হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, এবারও যেন তদ্রূপ সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু ভগবান আর তাহাদের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। বিপ্রচরণ আর ফিরিলেন না। ১২৬৪ সালের ২৬শে কার্ত্তিক [নভেম্বর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ] তারিখে তিনি জাহ্নবীতীরে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে নশ্বরদেহ পরিত্যাগ করিলেন। পতিতপাবনী সুরধুনী সাদরে সন্তানকে ক্রোড়ে লইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃচরণে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া সাশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিলেন।

বিপ্রচরণ বাবু ধার্ম্মিক ও কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমানকালে হেতমপুরে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি স্বকীয় ক্ষমতা বলে পৈত্রিক সম্পত্তির অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং হেতমপুরে অনেকগুলি দেবমন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হেতমপুরের মধ্যস্থলে "গোবিন্দ সায়ের" নামক যে সুবৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ১২৪৯ সালে বিপ্রচরণ বাবু খনন করাইয়া স্বীয় কন্যা দোলগোবিন্দ মণির নামে প্রতিষ্ঠা করেন, তদনুসারে ইহার নাম গোবিন্দ সায়ের। ইহার চতুষ্পার্শে প্রস্তর ও ইষ্টক রচিত সোপানাবলী ও তীরে কুসমকানন সুশোভিত। গ্রামের মধ্যে এই প্রকাণ্ড সরোবর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামবাসিগণ কখনও জলকষ্ট অনুভব করে না। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সকল সময়েই অগাধ সলিলরাশি বর্ত্তমান। গ্রামবাসিগণ ও বিদেশী পথিকগণ এই সুস্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া ও এই জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান রাজ কাছারির পার্শ্বে "বিরজা সায়ের" নামক একটী অনতি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বিপ্রচরণ বাবু খনন করাইয়াছিলেন এবং স্বর্গীয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের বিধবা পত্নী বিরজা সুন্দরী দেবীর নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার নাম বিরজা সায়ের। এই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজকর্ম্মচারিগণ ইহার জলে স্নানাবগাহন করিয়া থাকেন।

গোবিন্দ সায়ের পুষ্করিণীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে "সুখ সায়ের" নামক একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বিপ্রচরণ বাবু কর্ত্তৃক খনিত ও স্বীয় ভগিনী সুকুমারী দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বাঁধাঘাটের পূর্ব্ব শোভা এখন কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

হেতমপুর ও দুবরাজপুরের মধ্যস্থলে বর্ত্তমান কলেজ বোর্ডিংয়ের সন্নিকটে পথিপার্শ্বে "মান সায়ের" নামক যে পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায় উহা বিপ্রচরণের ভাগিনেয়ী মানমোহিনী দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত। কলেজ বোর্ডিংয়ের ছাত্রগণ ও পথিকগণ এই পুষ্করিণীর জল পান ও তথায় স্নান করিয়া থাকে।

গোবিন্দ সায়ের পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে "লালদিঘি" নামক একটী দীর্ঘকলেবরা ক্ষুদ্র সরসী দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এবং তত্তীরস্থ [তৎ তীরস্থ] পঞ্চ শিবমন্দির ও "বারদুয়ারি" নামক গৃহ বিপ্রচরণ বাবুর অন্যতম কীর্ত্তি। এই বারদুয়ারি তাঁহার আমলে কাছারিগৃহ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানকালে রাজা বাহাদুর [রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী] উহা সুন্দররূপে মেরামত করাইয়া "রোজি ভিল্লা" নাম দিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন "নূতন পকুর" নামক একটী পুষ্করিণী বিপ্রচরণ বাবু কর্ত্তৃক খনিত ও স্বীয় ভগিনী রুক্মিণী দেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিপ্রচরণ বাবু ১২৪০ সালে সরস্বতী পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি ১২৫১ সালে "সরস্বতী বাড়ী" নামক একটী সুদৃশ্য বাড়ী নির্ম্মাণ করান। কালক্রমে উহা ভগ্নপ্রায় হইলে বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর মেরামত

করাইয়া তন্মধ্যে "কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ" স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সরস্বতী পূজা এক্ষণ ঠাকুর বাড়ীর মধ্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সরস্বতী বাড়ীর নিকট যে বৃহৎ বাংলো দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বিপ্রচরণ কর্ত্তৃক ১২৫০ সালে নির্ম্মিত হয়। লোকে উহাকে "বড় আট চালা" বলিয়া থাকে ও তথায় কোনও কোনও রাজকর্ম্মচারী বাস করেন।

এই বাংলোর সন্নিকটে যে গোলাকার রাসমঞ্চ বিপ্রচরণ বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এখন দাতব্য চিকিৎসালয় স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

বিপ্রচরণ বাবু ১২৫৫ সালে [১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দ] একটী মডেল স্কুল স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন গ্রামবাসিগণের সুবিধার জন্য গ্রামের মধ্যে একটি হাট স্থাপন করেন। এইরূপ অশেষবিধ জনহিতকর কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি বিপ্রচরণ বাবুর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

এ স্থলে মহাত্মা বিপ্রচরণের সহৃদয়তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদত্ত হইল। বীরভূম জেলান্তর্গত পেরুয়া গ্রামনিবাসী মুরলীধর গুপ্ত নামক জনৈক আয়ুর্ব্বেদ পারদর্শী বৈদ্যসন্তান তাঁহার আশ্রয়ে গৃহ চিকিৎসক ছিলেন। বিপ্রচরণ বাবু তাঁহার বহুবিধ গুণগ্রামে মোহিত হইয়া সময়ে সময়ে অনেক সাহায্যও করিতেন ; কিন্তু মুরলীধরের সাংসারিক ব্যয় এত অধিক ছিল যে কিছুতেই তাঁহার অভাব মোচন হইত না বরং তিনি ক্রমশঃ প্রায় হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া একদা মুরলীধর অধিক উপার্জ্জনের আশায় স্থানান্তরে যাইবার প্রস্তাব করেন। বিপ্রচরণ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করতঃ তদ্দণ্ডেই ঋণমুক্ত করিলেন এবং তাঁহার সংসারের গুরুব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে লাগিলেন।

দুবরাজপুর নিবাসী রামযদু লায়েক ও রাসবিহারী মাহাতা নামক দুই জন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত বিপ্রচরণ বাবুর অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি বিপদে সম্পদে অনেক সাহায্য পাইতেন। বিপ্রচরণকে তাঁহারা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। যদি বিশেষ আবশ্যক বশতঃ বিপ্রচরণ বাবু তাঁহাদের নিকট ঋণ স্বরূপ টাকা চাহিতেন, তাহা হইলে যত টাকাই হউক না কেন এবং যে সময়েই হউক না কেন, এমন কি রাত্রি দ্বিপ্রহরে, বিনা লেখা পড়ায়, বিনা সুদে, তাঁহারা টাকা দিতেন, আর বিপ্রচরণ বাবুরও এরূপ কথার ঠিক ছিল যে তিনি যে দিন যে সময়ে ঐ টাকা পরিশোধের মৌখিক অঙ্গীকার করিতেন ঠিক সেই দিন সেই সময়ে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিতেন না।

পিতৃ প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ জীউর সেবা পরিচর্য্যায় বিপ্রচরণ বাবু একান্ত অনুরক্ত ও দেবদ্বিজে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁহার মোহরে নিম্নলিখিত কবিতা অঙ্কিত ছিল :–

"রাধাবল্লভ চরণে আশ।
শ্রীবিপ্রচরণ দ্বিজ দাস।"

হরিনাম সংকীর্ত্তনেও বিপ্রচরণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং তিনি অনেক কীর্ত্তনের গান রচনা করিতেন। তাঁহার স্বরচিত একটি গান এস্থলে উদ্ধৃত হইল

(কীর্ত্তন)

"ব্রজাঙ্গনার মাঝে বিরাজে রাধাশ্যাম রায়।
শ্যামজীমূত বেষ্টিত বিদ্যুৎ সব গোপীকায়।।
হেরিলাম শ্রীরাসমণ্ডল বেষ্টিত গোপীমণ্ডল।
জ্ঞান হয় মণি মণ্ডল বিধু কি কুণ্ডল।।
রাস-সরোবর মাঝে, মদন মোহন বিরাজে,
গোপীগণ সব হেমাম্বুজে, ত্রিভঙ্গ শ্যাম ভৃঙ্গ তায়।।
মত্ত ময়ূর ডাকে "গড় গড়" কোকিল পঞ্চম গাওরে,
যত তরুকুল বিকশিত ফুল খসি' পড়ে দোঁহার গায়।।[৮]

ক. ইঁহারা পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

খ. পারদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ও জ্ঞানদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

গ. এই কাপ্তেনের দক্ষিণ হস্ত কাটা গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে ঠুঁটো কাপ্তেন বলিত।

ঘ. এই প্রান্তর অদ্যাপি "সাঁওতাল কাটা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণচন্দ্র।

বিপ্রচরণের মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১২৩৩ সালে [১৮২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দ] জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম একত্রিংশ বৎসর হইয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বহুদূবর্ত্তী স্থান হইতে বহুতর পণ্ডিত এবং প্রায় লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।[ক] এই শ্রাদ্ধের যেরূপ বিরাট আয়োজন হইয়াছিল, এতদঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিগণের নিকট তাহা শুনিয়া উপকথার ন্যায় বোধ হয়। শুনিতে পাওয়া যায় কেবল কাঙ্গালী-ভোজন ক্রমান্বয়ে আট দিন ধরিয়া হইয়াছিল। কাঙ্গালীগণের মধ্যে কয়েকটি আসন্ন প্রসবা স্ত্রীলোক আসিয়াছিল, তাহারা বৃক্ষতলে সন্তান প্রসব করিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তাহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

এই শ্রাদ্ধে তিনি লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।[খ] পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি মহাশয় এই সময় ব্রাহ্মণ-ভোজনের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।[গ]

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এবং কাঙ্গালীগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিলে, কর্ম্মচারিগণ কৃষ্ণচন্দ্র বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হুজুর, কার্য্যের চরম হইয়াছে, খরচেরও চূড়ান্ত হইয়াছে আমরা এরূপ ব্যাপার চক্ষে দেখি নাই, কর্ণে শুনি নাই, কাঙ্গালীদের উৎপাতে কয়েক দিন রাস্তায় বাহির হইতে পারি নাই, আজ তাহারা চলিয়া গিয়াছে, এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।"

কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের প্রশংসাবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন "কই, এখনও কাঙ্গালী বিদায় সম্পূর্ণ হয় নাই ; তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছ কিন্তু আমি এখনও নিশ্চিন্ত হই নাই।"

কৃষ্ণচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কাঙ্গালী[ঘ] কে আছে?"

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক দুই জন ব্রাহ্মণকে নিকটে আহ্বান করিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া নীরবে রহিলেন।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে উল্লিখিত ব্রাহ্মণদ্বয় তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস পাঁচড়া গ্রাম এবং তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের নিবাস কেন্দুলি গ্রাম। নন্দগোপাল কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ষাট হাজার ও তারাচরণ সাতাশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঋণ পরিশোধ করা তাঁহাদের এক রকম অসাধ্য হইয়াছিল।

প্রথমে নন্দগোপাল কৃষ্ণচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "নন্দগোপাল, আমার এই পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছে ; তুমিও যথাসাধ্য পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু আর সকলের মত তোমার স্ফূর্তি নাই, উৎসাহ নাই, তাহার কারণ কি? তোমার মলিন মুখ ও বিষণ্ণভাব দেখিতেছি কেন?

নন্দগোপাল ভীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন "হুজুর, আমার অপরাধ মাপ করিবেন।"

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে ভীতিবিহ্বল দেখিয়া অভয় সপ্রদান-পূর্ব্বক বলিলেন "তোমার অপরাধ মাপ করিবার জন্যই ডাকিয়াছি, তোমার বিষাদের কারণ বুঝিয়াছি, তজ্জন্য তোমার মলিন মুখ দেখিয়া প্রাণে শান্তি পাইতেছি না।"

এই বলিয়া তিনি নন্দগোপালের ষাট হাজার টাকার তমসুকখানি বাহির করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সকলেই অবাক। কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন "নন্দগোপাল আজ আমি সকলের সাক্ষাতে তোমাকে এই মহা ঋণদায়ে মুক্তি দিলাম।"

নন্দগোপাল সহসা উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতিশয় আনন্দহেতু ব্রাহ্মণ যেন পাগল হইয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে তারাচরণ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান, মুখে বাক্য নাই, দৃষ্টি পলকহীন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন "তারাচরণ, তুমিও আমার অনেক উপকার করিয়াছ, আমি প্রত্যুপকার স্বরূপ কিছুই করি নাই, তজ্জন্য প্রাণে শান্তি পাইতেছি না। যাহা হউক আজ আমি তোমাকেও অব্যাহতি দিলাম, তোমাকেও আর ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না।" এই বলিয়া তারাচরণেরও সাতাশ হাজার টাকার তমসুকখানি বাহির করিলেন এবং সকলের সাক্ষাতে তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

তারাচরণের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, দরদর ধারায় অশ্রুবিগলিত হইয়া গণ্ডদেশ প্লাবিত করিল। দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এইবার আমি শান্তি পাইলাম, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হইলাম।"

এই দৃশ্য অতি বিরল। আজকালকার অধিকাংশ সুদখোর মহাজন সুদের মধ্যেই এক কপর্দ্দক ছাড়িতে চাহেন না, আসল টাকা ছাড়া ত দূরের কথা। তাঁহাদের ব্যবহার দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয় কৃষ্ণচন্দ্রের এই মহৎ কার্য্য অপার্থিব। তাঁহার ন্যায় কয়জনের মস্তকে এইরূপ বিপ্রকুলের অজস্র অকপট আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়?

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন "তোমরা এ কয়দিন অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছ কিন্তু ভালরূপ আহার করিতে সময় পাও নাই। অদ্য উদরপূর্ণ করিয়া ভোজন কর।"

এই বলিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণদ্বয়কে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করাইলেন। নন্দগোপাল আহারান্তে বলিয়া উঠিলেন "হুজুর, ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা দিতে হইবে।"

কৃষ্ণচন্দ্র কলম ধরিলেন এবং নন্দগোপালকে পাঁচড়া গ্রামখানি বিনা পণে পত্তনি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।[৬]

বিখ্যাত কবিওয়ালা সীতানাথ এই শ্রাদ্ধ ব্যাপারের বর্ণনা করিয়া শেষে গাইয়াছিলেন—

"কেউ পেলে হাতী ঘোড়া,
কেউ পেলে শালের যোড়া,
সীতানাথের কপাল পোড়া,
দুঃখী ব্রাহ্মণ ব'লে।"

বলা বাহুল্য যে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু তাঁহাকেও আশাতীত দানে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।[১]

পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র পৈত্রিক সম্পত্তির অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি ১২৬৬ সালের প্রারম্ভে লাট ভবানন্দপুর ক্রয় করিয়াছিলেন।[২] এই সময় মহাম্মদাবাদ পরগণা লইয়া এক ঘোরতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেই [৭৮ পৃষ্ঠা] বলা হইয়াছে, যে রাজনগরের রজবন্নেসা বিবি বিপ্রচরণ বাবুকে দেনার দায়ে পরগণা মহাম্মদাবাদ বিক্রয় করিয়াছিলেন, উক্ত বিবির উহা বিক্রয় করিবার অধিকার নাই বলিয়া রাজনগরাধিপতি মহম্মদ জ্বওহরজমান খাঁ এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন কিন্তু উহা আদালতের সুবিচারে কৃষ্ণচন্দ্রের অনুকূলে নিষ্পন্ন হইয়াছিল।[৩]

১২৬৬ সালে [১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে] কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃপ্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলটি মাইনর স্কুলে পরিণত করিয়াছিলেন, এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণের বিদ্যাধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সর্পী গ্রামনিবাসী কৈলাশচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা শিবসুন্দরীর সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিবাহ হয়। শিবসুন্দরীর গর্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের এক কন্যা ও তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কন্যাটি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, নাম রাজবালা সৌদামিনী, জন্ম ১২৫২ সালের ২৭শে চৈত্র।[৪] পুত্রগণের নাম রামরঞ্জন,

রাখাল চন্দ্র ও বাগাল চন্দ্র। রামরঞ্জন ১২৫৭ সালের ৭ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। রাখাল ১২৫৯ ও বাগাল ১২৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যখন বাগাল সাত দিনের শিশু, তখন শিবসুন্দরী সূতিকারোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সাধ্বী শিবসুন্দরী শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, স্বামী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি রখিয়া অকালেই সুখের সংসার পরিত্যাগ করেন।

এই সময় হইতে পাঁচ বৎসরকাল কৃষ্ণচন্দ্র বাবু শোকের উপর শোক পাইয়াছিলেন, ১২৬১ সালে চৈত্র মাসে (শ্রীরামনবমীর দিন) তাঁহার পত্নী শিবসুন্দরী, ১২৬৩ সালে ভাদ্র মাসে কনিষ্ঠ পুত্র বাগালের, ১২৬৪ পিতা বিপ্রচরণের ও পিতামহী দাশুমণির এবং ১২৬৫ সালের প্রারম্ভে মধ্যম পুত্র রাখাল চন্দ্রের মৃত্যু হয়। এইরূপ উপর্য্যুপরি শোকপ্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। তাঁহার দ্বিতীয়াত্মজ রাখাল চন্দ্র পীড়িত হইলে গ্রহাচার্য্যগণ পীড়া শান্তির জন্য স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিতবর তারানাথ বাচস্পতি মহাশয় "বারদুয়ারী" গৃহে সপ্তাহব্যাপী শান্তি করিতে লাগিলেন। শেষের দিন ঠিক পূর্ণাহুতি দিবার সময় রাখাল চন্দ্রের মৃত্যু হইল। শান্তি স্বস্ত্যয়নে কোনও ফল হইল না বলিয়া শোকোন্মত্ত কৃষ্ণচন্দ্র যাবতীয় কোষ্ঠি লইয়া গোবিন্দ সায়ের নামক পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে রামসুন্দর তর্কবাগীশ মহাশয়ও হেতমপুরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিবিধ শাস্ত্র প্রসঙ্গ দ্বারা পুত্রশোকাতুর কৃষ্ণচন্দ্রকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র আজীবন আর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন নাই, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গোবিন্দ সায়েরের উত্তরতীরস্থ "বড় আটচালা" গৃহেই বাস করিয়াছিলেন।

এ জগতে সুখ, শান্তি, শোক, তাপ, ইহার কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আজি যিনি মহাশোকে আত্মহারা হইয়া হৃদয় বিদারক ক্রন্দনরোলে গগন বিদীর্ণ করিতেছেন, আবার দেখিবে দু'দিন পরে তিনি স্বহস্তে অশ্রু মোচন করিতে করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র সৌদমিনী ও রামরঞ্জনের মুখ দেখিয়া ক্রমশঃ শোক সংবরণ করিলেন।

১২৬৩ সালে, সাজিনা নিবাসী শিবাশরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজবালা সৌদমিনীর বিবাহ হয়। বিবাহকালে কৃষ্ণচন্দ্র যৌতুকস্বরূপ অনেক ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজষ্টেট হইতে তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজবালা সৌদামিনী এখনও বর্ত্তমান আছেন। বর্ত্তমানকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চৌষট্টি বৎসর। তাঁহার চারি পুত্র ও তিন কন্যা।[৫] পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণ ও মধ্যম সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান, কনিষ্ঠ দুইটির মৃত্যু হইয়াছে।[৬] লক্ষ্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু মহাম্মদাবাদ পরগণার অন্তর্গত লাট ঘাসিপুর যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিয়া দৌহিত্র মুখ সন্দর্শন করেন। তদবধি উক্ত মহাল তাঁহাদের অধিকারভুক্ত রহিয়াছে।

রাজবালা সৌদামিনী বরাবর পিত্রালয়েই বাস করিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার বংশবিস্তার হইলে রাজবাটী সংলগ্ন স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করিতেছেন।[৮]

তরুণ বয়সে পত্নীবিয়োগ ও পুত্রদ্বয়ের অকাল মৃত্যু হওয়ায় কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে যে শোকশেলাঘাত হইয়াছিল, তাহার ব্যথা তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া কখন সদালাপে কখন বা আমোদ আহ্লাদে মনকে উৎফুল্ল রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেন কিন্তু প্রবল স্রোতে বালির বাঁধের ন্যায় উহা বৃথা হইত। অবশেষে সেই দারুণ যন্ত্রণা তাঁহাকে অল্পায়ু করিয়া ফেলিল। তিনি ১২৬৮ সালে শ্রাবণ মাসে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন।

প্রবল উদরাময় কথঞ্চিৎ হ্রাস হইল কিন্তু তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য আর পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন না। তখন চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুসারে তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সিউড়ি গমন করিলেন। তথায় আয়ুর্ব্বেদ মতে তাঁহার চিকিৎসা হইতে লাগিল। কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয় চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন ; তাহাতে বিশেষ ফললাভ না হওয়ায় সিউড়ির সিবিল সার্জ্জেন মি. সেরিডন সাহেব চিকিৎসা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাহাতেও কোনও ফল দর্শিইল না। তখন তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট জজ মি. ম্যালেট সাহেব তাঁহাকে সমুদ্র ভ্রমণে যাইবার পরামর্শ দিলেন ; কিন্তু তিনি বৃদ্ধা জননী ও নাবালক পুত্রকে গৃহে রাখিয়া সে অবস্থায় সুদূর বিদেশে যাইতে একান্ত অসম্মত হইলেন এবং অবশেষে হেতমপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যে এ যাত্রা আর রক্ষা পাইবেন না, তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আসন্ন মৃত্যু উপলব্ধি করিয়াও দুঃখিত হন নাই ; কিন্তু বৃদ্ধা জননী যে দারুণ পুত্রশোক পাইবেন এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে নাবালক পুত্র কিরূপে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করিবে এই দুইটি চিন্তায় তিনি কাতর হইলেন।

হেতমপুর নিবাসী নবীন কিশোর সরকার নামক জনৈক কায়স্থ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। জননী যে বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক পাইবেন তাহাতে কাহারও হাত নাই, কিন্তু নাবালকের বিষয় সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা হইবে, নবীন দেওয়ানের সহিত পরামর্শ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটি ক্ষমতাপত্র লিখিলেন এবং বাক্সের মধ্যে উহা চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেন।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে দুই মাস অতীত হইল। প্রাবৃট-গগন ধীরে ধীরে মেঘোন্মুক্ত হইয়া শরচ্চন্দ্রের বিমল কিরণে উদ্ভাসিত হইল কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের বদনমণ্ডলে বিষাদের ছায়া গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, তাঁহার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষ্ণচন্দ্র আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া ভগবানের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন। বৃদ্ধা জননী মন্দাকিনী দেবী হৃদয়বিদারক ক্রন্দনের সহিত তেত্রিশ কোটি দেবতার নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কন্যা রাজবালা সৌদামিনী ও শিশুপুত্র রামরঞ্জন পিতৃপদে লুণ্ঠিত হইয়া অজস্র অশ্রুধারা সিঞ্চন

করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহাদের কাতর ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করিল না। কৃষ্ণচন্দ্র রোরুদ্যমানা জননীর হস্তে মাতৃহীন শিশু রামরঞ্জনকে সমর্পণ করিয়া চিরদিনের জন্য চক্ষুমুদ্রিত করিলেন, তাঁহার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল।

১২৬৮ সালের কার্ত্তিক মাসে (কৃষ্ণপক্ষীয়া দ্বিতীয় তিথিতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়) [৫ কার্তিক, ২০ অক্টোবর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ] কৃষ্ণচন্দ্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি কেবল চারি বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্পদিন তিনি প্রায় দুঃখেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃ বর্ত্তমানে তিনি যেমন বিলাসী ও সৌখীন ছিলেন তেমনি দয়ালু, দানশীল ও সৎকর্ম্মান্বিত ছিলেন। তিনি স্বকীয় বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য যেরূপ অজস্র অর্থব্যয় করিতেন পরোপকার মহাব্রতেও তদ্রূপ অর্থব্যয় করিতেন, কোষাগার শূন্য হইলেও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না।

কৃষ্ণচন্দ্রের গাড়ী ঘোড়ায় অত্যন্ত সখ ছিল। তিনি একসময় কেপ্ অব্ গুড্ হোপ্ হইতে একটি ঘোটক আনয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত ঘোটক কলিকাতা হইতে আনিবার জন্য রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় নামক অশ্বাধ্যক্ষ ও হান্টার নামক জনৈক সাহেব কোচম্যান্ প্রেরিত হয়। তাহারা ঘোড়া লইয়া আসিতেছে, এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র বাবু সখের ঝোঁকে ঘোড়া দেখিবার জন্য পুরন্দরপুর পর্য্যন্ত গমন করেন। ঘোড়াটি তাঁহার নিকট আনীত হইলে তিনি উৎফুল্ল মনে যেমন তাহার গায় হাত বুলাইতে গিয়াছেন, অমনি সে লম্ফ দিয়া পলায়ন করিল। যে ঘোড়ার জন্য এত সখ এত অর্থব্যয়, ও এতদূর আসিয়াছেন, সে ফাঁকি দিয়া পলাইবে? কৃষ্ণচন্দ্র বাবু ঘোষণা করিলেন "যে ঐ ঘোড়া ধরিয়া আনিবে সে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবে। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ স্নান করিতে করিতে তখন ঐ সুন্দর ঘোড়াটি স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া ধরিয়াছিলেন। তিনি আর্দ্রবস্ত্রেই সেই ঘোড়া লইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হাজির করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে তাঁহার অঙ্গীকৃত পুরস্কার ও বেশীর ভাগ [য] একখানি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান বনাত প্রদান করিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের গাড়ীঘোড়ার অপূর্ব্ব সাজসজ্জা দেখিয়া কবি পরাণ সিংহ গাইয়া ছিলেন–

"বাবুজীর আছে যে সব গাড়ী ঘোড়া,
তা'রা একমিলানে মিলান করা,
যেন মতির ঘোড়া।
ইতস্ততঃ বাবু যারা আছে দেশস্থ,
তারা সবাই দ্বারস্থ,
দেখে গাড়ীঘোড়া, আরবী ঘোড়া,
কত বাবু ভেয়ে হচ্ছে খাড়া।।"

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু পিতৃ প্রতিষ্ঠিত সরস্বতী পূজা প্রতি বৎসর মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ও বর্দ্ধমান হইতে বিপণিশ্রেণী আনীত হইত, বহুমূল্য শাল, বনাত ও সোণারূপার নানারূপ অলঙ্কারের দোকান আসিয়া মেলার শোভাবর্দ্ধন করিত। এদিকে অ্যান্টনি সাহেব, ভোলা ময়রা, সীতানাথ, পরাণ সিং [সিংহ] প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবির গান হইত।[ক] আর ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতির কথাই নাই, নানাবিধ উৎসবে সপ্তাহকাল দিগন্ত প্রণোদিত হইত।

কৃষ্ণচন্দ্রের এইরূপ নানাবিধ বিলাসিতা ও সৌখীনতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। দুঃখের বিষয়, তিনি প্রথম বয়সে যেরূপ আমোদ আহ্লাদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নানারূপ শোকে তেমনি ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। নচেৎ পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার সৎকর্ম্মে যেরূপ মতি হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় তিনি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিলে তাঁহার দ্বারা অনেক সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত ও বিবিধ কীর্ত্তি স্থাপিত হইত।

কৃষ্ণচন্দ্র বড় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি যাবতীয় কর্ম্মফল শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া নিষ্কামভাবে সংসারের কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার সময়ের যে সমস্ত পুরাতন কাগজপত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বারা এই বিষয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শ্রীশ্রী ৺রাধাবল্লভ জীউকে যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী ভাবিয়া স্বয়ং সেবাইতস্বরূপে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার মোহরে অঙ্কিত ছিল–

"রাখ মান কৃষ্ণচন্দ্র।"

উল্লিখিত কয়েকটি কথায় তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়ভাব প্রকাশ পায়।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু ১২৫৪ সালে, "গোবিন্দ সায়ের" নামক পুষ্করিণীর অগ্নিকোণে, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।[খ] মন্দির গাত্রে লিখিত আছে–

"স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র মুদেকর।
চন্দ্রনাথ শিবাচন্দ্র হর মে স্ত্রী চন্দ্রশেখর।।"

ক. নিমন্ত্রণ পত্রের রচিত শ্লোক–

"গঙ্গায়াং ত্যক্তদেহস্য পিতুরাদ্যক্রিয়া বুধাঃ।
স্বরমে রসমে ঘন্ত্রে সমাগত্য সমাপ্যতাম।।"[৯]

খ. সে সময় এক লক্ষ টাকা খরচ করিলে যেরূপ বিরাট আয়োজন হইত, বর্ত্তমান কালে চারি পাঁচ লক্ষ টাকায় সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। কারণ তখন অপেক্ষা এখন প্রায় সমস্ত দ্রব্যের মূল্য প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

গ. তারানাথ তর্ক বাচস্পতির জীবন চরিতের ৪০ পৃষ্ঠায় এই ব্রাহ্মণ-ভোজন সম্বন্ধে লিখিত আছে–

"হেতামপুরের রাজবাটীতে একবার লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তথায় ভোজনাদি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এরূপ সমারোহ কার্য্যে সুবন্দোবস্ত করা তাঁহার মত কাহারও ক্ষমতা ছিল না।"[১০]

ঘ. "কাঙ্গাল" শব্দই বিশুদ্ধ ; এতৎপ্রদেশে চলিত কথায় "কাঙ্গালী" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ঙ. নন্দগোপালের বংশধরগণ অদ্যাপি পাঁচড়া গ্রামখানি পত্তনিস্বত্বে দখল করিতেছেন।

চ. বংশ পত্রিকায় বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর স্বর্গারোহণের পর তদীয় পুত্র রামরঞ্জন পিতৃ-পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। রামরঞ্জন ১২৫৭ সালে [৭ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ] জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতৃ-বিয়োগের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সম্পত্তি কিরূপে রক্ষিত হইবে, কে তাঁহার অভিভাবক হইবেন, কে জমিদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইত্যাদি নানারূপ চিন্তায় কর্ত্রী ঠাকুরাণী[ক] অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। শুষ্কপ্রায় প্রাচীন পাদপের কোটরস্থিত বহ্নি বায়ুস্পর্শে ক্রমশঃ যেরূপ প্রবল হইয়া উঠে, বৃদ্ধার হৃদয়নিহিত পুত্রশোকও এই দুশ্চিন্তা সহযোগে তদ্রূপ প্রবল হইয়া উঠিল।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু রুগ্নশয্যায় শায়িত হইয়া যে ক্ষমতাপত্র লিখিয়াছিলেন, বাক্স হইতে তাহা বাহির করিয়া দেখা গেল যে তিনি বিশ্বস্ত দেওয়ান নবীন কিশোর সরকারের হস্তে নাবালক ও নাবালকের সম্পত্তির সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেওয়ান মহাশয় এক্ষণ এই গুরুভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন এবং সেই ক্ষমতাপত্রখানি সর্ব্বজনসমক্ষে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি স্বীয় জামাতা কুলদানন্দ বাবুকে[খ] এই ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু তিনিও উচ্চপদ ও ভবিষ্যৎ পেন্সন প্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

আত্মীয় ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহই যখন নাবালকের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, তখন মন্দাকিনী দেবী হতাশ হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভার বহন করিতেছেন, অবশেষে সেই জগদ্‌গুরুর পাদপদ্মে সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। অনাথবৎসল ভগবানও নিরুপায়ের উপায়–নিরাশ্রয়ের আশ্রয়–নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বীরভূমের কালেক্টার মি. লুইস সাহেব নাবালক রামরঞ্জনের সম্পত্তিসমূহ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন এবং বাঘ-ডহরি গ্রামনিবাসী মহানন্দ চৌধুরীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া হেতমপুরে প্রেরণ করিলেন।[১] রায় মহাশয় হেতমপুরে উপস্থিত হইয়া নবীন দেওয়ানের নিকট সমুদয় সম্পত্তি বুঝিয়া লইলেন।

যথাসময়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর আদ্যশ্রাদ্ধাদি সুসম্পন্ন হইল। এতদুপলক্ষে বহুতর আত্মীয় কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম, তাঁহাদের যথাবিহিত সম্মান ও সৎকার, সপ্তাহব্যাপী ব্রাহ্মণ-ভোজন ও কাঙ্গালী-ভোজন প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথানুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছিল ; বারংবার তদ্বিষয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা বাহুল্য মাত্র।

বীরভূমের তদানীন্তন জজ মি. ও. ডবলিউ. ম্যালেট সাহেবের সহিত কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর অত্যন্ত সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি কালেক্টার সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নাবালকের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কোর্টের নিয়ম অনুসারে কালেক্টার সাহেব নাবালককে বিদ্যাশিক্ষার্থ ওয়ার্ড স্কুলে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইহাতে নাবালকের নানাবিধ অসুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া জজ সাহেব বাহাদুর তাঁহাকে সিউড়ির বাসায় আনয়ন করিলেন এবং তত্রত্য জেলা স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক বাবু মহেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে[গ] গৃহশিক্ষক (প্রাইভেট টিউটার) নিযুক্ত করিলেন।[২] জজ সাহেবের এই ব্যবস্থায় কালেক্টার সাহেব বা কোর্ট কোনও আপত্তি করিলেন না।

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল। রামরঞ্জন সিউড়িতে থাকিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, সুতরাং কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে একাকিনী হেতমপুরে বাস করিতে হইল। অকালে পুত্র ও পুত্রবধূ হারাইয়া বৃদ্ধা শোকে দুঃখে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছেন। যে পৌত্র রামরঞ্জনের মুখ চাহিয়া কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতেছেন, তিনিও বিদেশে, বৃদ্ধার প্রাণে আর শান্তি নাই। যে স্নেহের ধন রামরঞ্জনকে তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে পারিতেন না তাঁহার দর্শনাভাবে সুরম্য হর্ম্ম্যনিকেতনও শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সংসারে তাঁহার সকল সাধ--সকল আশা--ফুরাইয়াছে, এক্ষণ তিনি পৌত্রের বিবাহ দিয়া মরিতে পারিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করেন। তিনি ভাবিলেন, রামরঞ্জনের বিবাহ হইলে গৃহলক্ষ্মী নববধূর শুভাগমনে এই শূন্যগৃহ আর শূন্য বোধ হইবে না। আশা-চপলার এইরূপ বারংবার ক্ষণিক চমকে বৃদ্ধার আঁধার হৃদয় আলোকিত হইতে লগিল। তিনি অচিরে পৌত্রের বিবাহ দিতে কৃতসংকল্প হইলেন এং ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরীকে আহ্বান-পূর্ব্বক স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন।

বিবাহের কথা শুনিয়া কর্ম্মচারিগণ সকলেই আনন্দিত হইল। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান নবীন কিশোর সরকার পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আগ্রহ দেখিয়া মহানন্দ চৌধুরী কোনওরূপ প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু তিনি কোর্টের অনুমতি গ্রহণ কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। আবেদনপত্রে বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ-জন্য অর্থপ্রাপ্তিরও প্রার্থনা থাকিল।

বিবাহের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইলেন কিন্তু বিবাহ কোথায় হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। মহানন্দ চৌধুরী কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট এই প্রশ্ন করিলে, বৃদ্ধা অতিকষ্টে

অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্র যে পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই সহিত রামরঞ্জনের বিবাহ দিতে হইবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইবে না।

কৃষ্ণচন্দ্র বাবু কখন কোথায় কিরূপে পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কাটোয়ায় অবস্থানকালে একদা কৃষ্ণচন্দ্র বাবু গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বালিকা কতিপয় ভদ্রমহিলার সহিত গঙ্গাস্নান-জন্য আসিয়াছেন। এই অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না বালিকাটি কে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার বড় ইচ্ছা হইল। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে সেই সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না বালিকা দ্বারকা[ঘ] গ্রামনিবাসী বাবু কালাচাঁদ রায়ের কন্যা। তিনি কথায় কথায় আরও জানিলেন যে বালিকার বিবাহের সম্বন্ধ এখনও স্থির হয় নাই। তখন তিনি সেই সুরধুনীতীরেই বলিয়াছিলেন যে যদি কালাচাঁদ বাবু অসম্মত না হন, তাহা হইলে তিনি এই বালিকাটিকে পুত্রবধূ করিবেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাবু এই কথা জননী মন্দাকিনী দেবীকে বলিয়াছিলেন কিন্তু তিনি অকালে কালকবলিত হওয়ায় তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। তজ্জন্য, পাত্রীর কথা উত্থাপিত হইলে, মন্দাকিনী দেবীর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল।

এই বিবরণ শুনিয়া মহানন্দ চৌধুরীরও চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। তিনি কোর্টের অনুমতি আসিবার পূর্ব্বেই বিবাহের আয়োজন করিতে অনুমতি দিলেন। শুভবিবাহের দিন স্থির হইল এবং দ্বারকা গ্রামে কন্যাগৃহে শুভসংবাদ প্রেরিত হইল। কালাচাঁদ বাবুও সম্মতিসূচক সংবাদ দিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কোর্ট হইতে হুকুম আসিল যে রামরঞ্জন সাবালক না হইলে বিবাহ দিতে পাইবে না।

বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ। কোর্টের আদেশ শুনিয়া সকলের হর্ষে বিষাদ হইল। বিবাহের সমস্তই আয়োজন হইয়াছে, নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত না হইলেও আত্মীয় কুটুম্বগণ বিবাহের সংবাদ শুনিয়াছেন, এ অবস্থায় কিরূপে বিবাহ বন্ধ থাকিবে। নবীন দেওয়ান মহানন্দ চৌধুরীর সহিত পরামর্শ করিয়া শীঘ্র সিউড়ি গমন করিলেন এবং জজ সাহেবের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। জজ সাহেব বলিলেন "কোর্টের আদেশ অনুসারে এক্ষণ চলিতে হইবে, আমার কোনও হাত নাই, অতএব তোমাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর।"

নবীন সরকার সিউড়ি হইতে প্রত্যাগত হইয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বলিলেন যে জজ সাহেব এক রকম সম্মতি দিয়াছেন। অতএব কালেক্টার সাহেবকে আর না জানাইয়া শীঘ্র শীঘ্র শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। "শুভস্য শীঘ্রং" এই প্রবচন অনুসারে শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল এবং অবস্থানুযায়ী নিমন্ত্রণপত্র লিখিত হইয়া সন্গোপনে প্রেরিত হইল।[ঙ]

১২৭১ সালের ৭ই বৈশাখ তারিখে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। কালেক্টার সাহেব বা কোর্ট এসব বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন না। কোর্ট হইতে বিবাহের অনুমতি

প্রদত্ত হয় নাই এবং বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ-জন্য টাকাও মঞ্জুর হয় নাই, এ অবস্থায় যে এখন বিবাহ হইবে, কালেক্টার সাহেব তাহা ভাবেন নাই, সুতরাং তিনি আর কোনও সংবাদ রাখেন নাই। যাহা হউক, দ্বারকা নিবাসী বাবু কালাচাঁদ রায়ের কন্যা শ্রীমতী পদ্মসুন্দরী দেবীর সহিত রামরঞ্জনের শুভবিবাহ শুভদিনে ও শুভলগ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হেতমপুরবাসিগণ ও কর্ম্মচারিগণ বিবাহোৎসবে মাতিয়া উঠিলেন, হেতমপুর আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর যে বিষাদের ঘনছায়া পতিত হইয়া এতদিন হেতমপুর অন্ধকারময় হইয়াছিল, আজি যেন তাহা অপসারিত হইয়া উৎসবালোকে আলোকিত হইয়া উঠিল। বহুকণ্ঠ নিঃসৃত আনন্দরবে ও বিবিধ বাদ্যধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নববধূর মুখাবলোকন করিয়া মন্দাকিনী দেবীর আনন্দাশ্রু বিগলিত হইল, তাঁহার সন্তপিত হৃদয় এতদিনে কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল।

রামরঞ্জনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া বীরভূমের কালেক্টার সাহেব ভয়ানক চটিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন যে রামরঞ্জন নিতান্ত নাবালক এবং তাঁহার পিতামহী স্ত্রীলোক, উভয়েই সমান ; তাঁহাদের কোনও দোষ নাই। কেবল কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানশূন্য স্থানীয় লোক জুটিয়া নিরীহ নাবালকের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। রামরঞ্জনকে কলিকাতায় পাঠাইলে এই বাল্যবিবাহ কদাচ হইত না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং সমস্ত বিষয় গবর্ণমেন্টে রিপোর্ট করিলেন। কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়া নাবালকের বিবাহ দেওয়ায় গবর্ণমেন্টও অতিশয় চটিলেন এবং রামরঞ্জনকে কলিকাতার ওয়ার্ড স্কুলে পড়িবার আদেশ দিলেন। কালেক্টার সাহেব তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ম্যানেজার মহানন্দ চৌধুরীর যোগে এই বিবাহ হইয়াছে বলিয়া কালেক্টার সাহেব তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপদে বাবু দুর্গাদাস বসুকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। দুর্গাদাস বাবু যথাসময়ে হেতমপুরে আসিয়া মহানন্দ চৌধুরির নিকট চার্জ্জ বুঝিয়া লইলেন এবং রামরঞ্জনকে কলিকাতায় পাঠাইতে উদ্যত হইল।

কোর্টের এই হুকুম শুনিয়া মন্দাকিনী দেবী অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। সম্পত্তি যাহাই হউক কেন, তজ্জন্য তিনি কাতর নহেন ; কিন্তু অল্পবয়স্ক পৌত্রকে সুদূর বিদেশে পাঠাইতে অসম্মত হইলেন। গবর্ণমেন্ট যে তাঁহার পৌত্রের ভাবী মঙ্গল কামনায় এইরূপ কঠোর আদেশ করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অপ্রাপ্তবয়স্ক পিতৃহীন ধনি-সন্তানগণের সম্পত্তি রক্ষার্থ প্রজাবৎসল বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি এতদ্দেশে "কোর্ট-অব্ ওয়ার্ডস্" স্থাপন না করিতেন, তাহা হইলে দেশের অনেক ধনাঢ্য পিতৃহীন শিশুকে শত্রু কর্ত্তৃক প্রতারিত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথের ভিখারী হইতে হইত। কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ক ধনি-সন্তান পিতৃহীন হইবা মাত্র গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতঃ অনুক্ষণ তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যাধ্যয়ন, সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও পৈত্রিক ঋণ পরিশোধ করিয়া প্রকৃত পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

এই মহৎ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট এতদ্দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তৎকালে উক্ত কোর্টের নিয়মাবলীও অপেক্ষাকৃত কঠোর ছিল। বিশেষতঃ তৎকালে কলিকাতায় এখনকার মত ড্রেণ ও জলের কল প্রভৃতি না থাকায় তত্রত্য জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। এই সমস্ত কারণে মন্দাকিনী একমাত্র বংশধরকে তথায় পাঠাইতে অসম্মতা হইলেন। তাহার উপর কতকগুলি স্থানীয় মুর্খলোকে তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া দিল। কোনও মুর্খ বলিল, অতঃপর রামরঞ্জনকে বিলাতে লইয়া যাইবে ; কেহ বলিল খৃষ্টান করিবে– ইত্যাদি নানারূপ অলীক কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি গবর্ণমেন্টের মহদুদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। ম্যানেজার দুর্গাদাস বাবু বলিলেন যে সহজে রামরঞ্জনকে না পাঠাইলে গবর্ণমেন্ট বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইবেন। মন্দাকিনী তাহা শুনিয়া রামরঞ্জনকে হেতমপুর হইতে স্থানান্তরিত করিলেন।

নাবালককে কলিকাতার ওয়ার্ড স্কুলে পড়াইবার জন্য কোর্ট হইতে ঘন ঘন তাগাদা আসিতে লাগিল। কালেক্টার সাহেব ম্যানেজারের উপর জুলুম করিতে লাগিলে দুর্গাদাস বাবু সমস্ত বিষয় রিপোর্ট করিলেন। তখন কালেক্টার সাহেব অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া দুর্গাদাস বাবুর উপর হুকুম জারি করিলেন যে রামরঞ্জনকে যেমন করিয়া হউক ধরিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তাঁহার সমুদয় অস্থাবর সম্পত্তি সিউড়িতে চালান দিতে হইবে। তদনুসারে দুর্গাদাস বাবু যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি চালান দিলেন। বহুমূল্য গালিচা, দুলিচা, কম্বল, সতরঞ্চ, খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, ঝাড়, লণ্ঠন, প্রভৃতি হইতে গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, ছাগটি পর্য্যন্ত গৃহশূন্য করিয়া প্রেরিত হইল। হেতমপুরবাসিগণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া যুগপৎ দুঃখে ও ভয়ে হাহাকার করিতে লাগিল। মন্দাকিনী দেবী বলিলেন "যদি সাহেব এক একখানি করিয়া দালানের সমস্ত ইটগুলি লইয়া যায়, ভিক্ষা করিয়া খাইব, তথাপি রামরঞ্জনকে কলিকাতায় পাঠাইতে পারিব না।"

অতঃপর রামরঞ্জনের অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ নিলামে বিক্রীত হইল এবং নিলামোৎপন্ন টাকা হইতে নাবালকের পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া অবশিষ্ট টাকা গবর্ণমেন্ট নাবালকের নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখিলেন।

অনন্তর দুর্গাদাস বাবু রিপোর্ট করিলেন যে রামরঞ্জনকে কোথায় গুপ্তভাবে রাখা হইয়াছে তাহার সন্ধান নাই। কালেক্টার সাহেব আদেশ করিলেন "গৃহ হইতে সমস্ত লোক ও রাধাবল্লভ বিগ্রহকে বাহির করিয়া সমস্ত দরজায় তালাবন্ধ করিবে।"

দুর্গাদাস বাবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে আর সকলই করিতে প্রস্তুত, কিন্তু হিন্দু হইয়া হিন্দুর আরাধ্য দেবতাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে শুনিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। ইহার পর নাবালককে লইয়া কতই না হাঙ্গামায় পড়িতে হইবে ভাবিয়া তিনি ভীত হইলেন এবং কার্য্যে ইস্তফা দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে রামরঞ্জন ধৃত হইবার ভয়ে এস্থান হইতে অন্যস্থানে, এ গ্রাম হইতে অন্যগ্রামে গমনাগমন-পূর্ব্বক গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। কতকগুলি নির্ব্বোধ লোকের নির্ব্বুদ্ধিতায় নিরীহ নাবালক অলীক আশঙ্কায় ভীত হইয়া অনর্থক ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কষ্টের কাহিনী শুনিলে বাস্তবিক হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অশ্রুসংবরণ করা যায় না। এতৎসংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকান্তরে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া বর্ত্তমান পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না।[ছ]

দুর্গাদাস বাবু কার্য্যে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলে কালেক্টার সাহেব স্বয়ং দলবল লইয়া হেতমপুরে উপস্থিত হইলেন। দারোগা, জমাদার, কনষ্টেবল, চৌকিদার প্রভৃতি পুলিশ কর্ম্মচারিগণে হেতমপুর পূর্ণ হইল। কালেক্টার সাহেব হেতমপুর গ্রামখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাস করিলেন কিন্তু রামরঞ্জনের কোনও সন্ধান পাইলেন না। পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ক্রমে ক্রমে রামরঞ্জনের শ্বশুরালয়, মাতুলালয় প্রভৃতি আত্মীয় কুটুম্বগণের বাড়ী খানাতল্লাসী করিল কিন্তু অগাধ সলিলে নিক্ষিপ্ত বারি বিন্দুর ন্যায় রামরঞ্জন কোথায় অন্তর্হিত হইলেন কেহই তাহার সন্ধান করিতে পারিলেন না। কালেক্টার সাহেব বিরক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং নবীন কিশোর সরকার, রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়, তারাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে ধরিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নির্দ্দোষী জানিয়া অবশেষে অব্যাহতি দিলেন।

অতঃপর কোর্ট হইতে এ. হিউম্ স্মিথ্ নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার ও বাবু ধরণীধর রায় সহকারী ম্যানেজার হইয়া হেতমপুরে আসিলেন। তাঁহারা নাবালকের সন্ধানে চারিদিকে বিস্তর লোক প্রেরণ করিলেন এবং ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

সন ১২৭১ সালের বৈশাখ হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত রামরঞ্জন লুক্কায়িতভাবে নানা স্থানে অবস্থান-পূর্ব্বক ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে একদা বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ভদ্রলোকটি সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বিশেষরূপ দুঃখিত হইলেন এবং রামরঞ্জনের জনৈক সহচরকে[জ] বুঝাইয়া নাবালককে কোর্টে হাজিরা হইবার জন্য পরামর্শ দিলেন।[ঝ] তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রামরঞ্জন কলিকাতায় গমন করিলেন এবং জনৈক মোক্তারের দ্বারা কোর্টে দরখাস্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই দরখাস্তে এইরূপ প্রার্থনা করা হইল যে নাবালক কলিকাতায় বাস করিতে ভয় করেন, তজ্জন্য কাশীতে পড়িবার হুকুম প্রার্থনা করেন ; হুকুমের বিজ্ঞাপন টাউনহলে দিলে নাবালক হাজির হইবেন। কিন্তু সেই মোক্তার এই বেনামী দরখাস্ত দাখিল করিতে সম্মত হইলেন না, ভাবিলেন নাবালকের দায়ে তাঁহাকে হয় ত দায়গ্রস্ত হইতে হইবে। তখন রামরঞ্জনের সহচরগণ পরামর্শ করিয়া সেই দরখাস্ত ডাকযোগে কোর্টে প্রেরণ করিলেন। তৎপরদিনেই কোর্ট হইতে

বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল যে নাবালক রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী জেলা কোর্টে হাজির হইলে তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। টাউনহলে এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া রামরঞ্জন সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে সিউড়িতে উপস্থিত হইলেন এবং কালেক্টার সাহেবের কুঠিতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কালেক্টার সাহেব নাবালককে অভয় প্রদান-পূর্ব্বক আশ্বস্ত করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার কাশীধামে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। বীরভূমের তাৎকালিক সিভিল সার্জ্জন সেরিড্ন্ এই মর্ম্মে এক সার্টিফিকেট দিলেন যে কলিকাতায় বাস করিলে রামরঞ্জনের স্বাস্থ্যহানি হইবার সম্ভাবনা। মি. লুইস সাহেবও অনুকূল মত লিপিবদ্ধ করিয়া কোর্টে রিপোর্ট করিলেন।[ঞ] তদনুসারে কোর্ট হইতে হুকুম হইল যে নাবালক কলিকাতায় অন্ততঃ ছয় মাস কাল থাকিয়া পরে কাশীতে পড়িতে যাইবেন।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রামরঞ্জন অনতিবিলম্বে কলিকাতায় গমন করিলেন এবং কোর্টে হাজির হইয়া ওয়ার্ড স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়[ট] তৎকালে ওয়ার্ডের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। তিনি রামরঞ্জনের বিশেষ যত্ন লইয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, মজিলপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসু, নাটোরের রাজা যোগেন্দ্র নাথ রায়, দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ, তাহেরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর প্রভৃতি কলিকাতার ওয়ার্ড স্কুলে রামরঞ্জনের সহাধ্যায়ী ছিলেন। দেখিতে দেখিতে ছয় মাস গত হইল কলিকাতার সুবিখ্যাত ডাক্তার বেলি সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট লইয়া রামরঞ্জন কাশীতে পড়িবার জন্য পুনরায় এক দরখাস্ত করিলেন। অনন্তর কোর্ট তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।[ঠ] ১২৭২ সালের ভাদ্র মাসে রাজেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা ব্রজেন্দ্র বাবু রামরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া কাশী গমন করিলেন এবং কাশীর ওয়ার্ড স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ পালধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নাবালককে রাখিয়া আসিলেন। পালধি মহাশয় তথায় রামরঞ্জনকে অতিশয় যত্নে রাখিয়াছিলেন।[ড] কুচবিহারের মহারাজা ভূপনারায়ণ সিংহ, বস্তির রাজা শীতলা বকস, নাগোয়ার রাজা উদিতনারায়ণ সিংহ এবং হনুমানগড়ের রাজপুত্রগণ (ভরত সিংহ, রামসিংহ ও লছমন সিংহ) কাশীর ওয়ার্ড স্কুলে রামরঞ্জনের সহপাঠী ছিলেন। তন্মধ্যে নাগোয়ার রাজপুত্র উদিতনারায়ণ সিংহের সহিত রামরঞ্জনের বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল।

পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে প্রায় চারি বৎসর অতিবাহিত হইলে, ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ [মে-জুন ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ] মাসে রামরঞ্জন সাবালক গণ্য হইলেন এবং স্বগৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর রামরঞ্জন বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া, সঙ্গিগণ ও পালধি মহাশয়ের নিকট বিদায়গ্রহণ-পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। বহুদিন পরে রামরঞ্জনকে পাইয়া মন্দাকিনী দেবী যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। হেতমপুরবাসিগণ সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং সুদূর গ্রামবাসী আত্মীয় কুটুম্বগণ হেতমপুরে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রীত হইলেন।

কর্ত্রী ঠাকুরাণী মন্দাকিনী দেবী অনতিবিলম্বে দ্বারকা গ্রাম হইতে বধূ আনয়ন করিলেন। দম্পতিযুগল বহুদিন পরে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

১২৭৬ সালের আশ্বিন মাসে কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্ পিতৃঋণ [৮০০০০ টাকা] পরিশোধ করণান্তর কোম্পানির কাগজে এক লক্ষ টাকা জমা দেখাইয়া রামরঞ্জনের সম্পত্তি ছাড়িয়া দিলেন।[৭] অতঃপর পৈত্রিক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া রামরঞ্জন স্বহস্তে সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক্ কর্ত্তৃক রামরঞ্জন ১২৮২ সালে (ইং ১৮৭৫ সালের ১২ মার্চ তারিখে) "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন[৮] এবং ১২৮৪ সালে (ইং ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে) "রাজা বাহাদুর" নামে আখ্যাত হন।[৯] রাজনগরের মুসলমান রাজগণের অধঃপতনের পর রামরঞ্জন ব্যতীত বীরভূমের আর কোনও ভূম্যধিকারী এ পর্য্যন্ত "রাজা" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন নাই। রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের জমিদারী বীরভূম হইতে সুদূর সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বীরভূমের প্রাচীন রাজধানী "রাজনগর" তাঁহার অধিকারভুক্ত। ফলতঃ রাজা রামরঞ্জনকে কেবল হেতমপুরাধিপতি না বলিয়া বীরভূমির অধিপতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক. রামরঞ্জনের বৃদ্ধা পিতামহী মন্দাকিনী দেবী।

খ. বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় তৎকালে রংপুরের সবজজ ছিলেন।

গ. কেন্দুয়া নিবাসী বর্ত্তমান সেটেলমেন্ট অফিসার যতীশ বাবুর পিতা।

ঘ. চলিত কথায় দাঁড়কা নামে খ্যাত। [লাভপুরের উত্তরে প্রায় ১৩ কিমি দূরে অবস্থিত]

ঙ. নিমন্ত্রণপত্রের রচিত শ্লোক–

"কুজমুখ ভবনে, বিলসিত তপনে, শশভৃতি মুনিগুণী তাহে।
হেতমপুরগত, ভবন সমাগত, সমিতিং শোভয়মান।
পত্রি নিমন্ত্রিত, করুণাযন্ত্রিত, তং পূরয় বহুমানং।"[১০]

চ. ইনি তৎকালে বর্দ্ধমানে মতরর্জ্জুম ছিলেন।

ছ. এতদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও কবি শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বাল্য-কাহিনী" নামক পুস্তকে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ হইয়াছে। উহা রাজবাড়ী হইতে বিনা মূল্যে বিতরিত হয়।[১১]

জ. নন্ডীরাজপুর নিবাসী বিজয়চন্দ্র লায়েক।

ঝ. ইনি পরে "রাজা" উপাধি পাইয়াছিলেন।[১২]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বর্ত্তমান রাজবংশ।

"ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ" এই প্রচলিত কথাটি সচারাচর সৌভাগ্যবান ব্যক্তির প্রতি প্রয়োগ করা যায়। হেতমপুরাধিপতি রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এই সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধিকারী। রাজা বাহাদুর যেরূপ সৌভাগ্যবান, তদীয় সহধর্ম্মিণী রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীও তদ্রূপ সৌভাগ্যবতী। আবার এরূপ সৌভাগ্য অতিশয় পুণ্যবান ও পুণ্যবতী নরনারীর পক্ষেই সম্ভব। বহু পুণ্যফলেই এই দম্পতিযুগল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ও অনেকগুলি সন্তানের জনকজননী।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপ রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর পতিগৃহে শুভাগমনের পর দিন দিন রাজা বাহাদুরের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাই এতদ্দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার ও কবি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় একদা গাইয়াছিলেন–

"যে অবধি লক্ষ্মি [যা] এসেছে এ পুরে,
তদবধি ধন উথলিছে ঘরে,
তব পুণ্যফলে বৎসরে বৎসরে,
আয়বৃদ্ধি রাজার হাজার হাজার।"

এই উক্তি নিতান্ত কবি-কল্পিত নহে, বাস্তবিক সত্য। রাজা বাহাদুরের আমলে জমিদারীর পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পিতৃপিতামহের আমলে যে আয় ছিল, তদপেক্ষা এখন অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে।

কালক্রমে এই রাজদম্পতি পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা লাভ করেন। রাজকুমারগণের নাম নিত্যনিরঞ্জন, সত্যনিরঞ্জন, মহিমানিরঞ্জন, সদানিরঞ্জন ও কমলানিরঞ্জন এবং রাজকুমারীগণের নাম ভূপবালা, নৃপবালা, রাসবালা ও অমিলাবালা। রাজা বাহাদুরের তিন পৌত্র, দুই পৌত্রী, এক দৌহিত্র ও পাঁচ দৌহিত্রী। কুমার নিত্যনিরঞ্জনের পুত্র জ্ঞানরঞ্জন, কুমার সত্যনিরঞ্জনের পুত্র ব্রহ্মরঞ্জন ও কুমার কমলানিরঞ্জনের পুত্র বিশ্বরঞ্জন– এই তিন পৌত্র। কুমার সত্যনিরঞ্জনের কন্যা ভানুবালা ও কুমার সদানিরঞ্জনের কন্যা প্রমোদবালা– এই দুই পৌত্রী। রাজকুমারী নৃপবালা দেবীর পুত্র পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়– একমাত্র দৌহিত্র। রাজকুমারী ভূপবালা দেবীর কন্যা আশালতা, নৃপবালা দেবীর কন্যা ব্রজরাণী এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী অমিলাবালা দেবীর কন্যা সুরমা, সরমা এবং প্রতিমা– এই পাঁচ দৌহিত্রী। অতঃপর রাজা বাহাদুর অচিরে প্রপৌত্রের মুখ সন্দর্শন করিবেন, এরূপ আশা করা যায়।[১]

অতিশয় পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবান না হইলে কে এইরূপ বহু পরিবারবেষ্টিত হইয়া প্রভূত সম্পত্তি উপভোগ করিতে পারেন অথবা কাহার এমন সুখের সংসার হইতে পারে? কিন্তু মানুষের এত সুখ দেখিয়া দুর্ব্বল মানবহৃদয়ে হিংসা হইতেই পারে, নিরপেক্ষ বিধাতারও মনে বোধ হয় হিংসার উদ্রেক হইয়া থাকে। তাই তিনি সুখের সংসারে সময়ে সময়ে দুঃখের অনল জ্বালাইয়া দেন—তাই তিনি পরম দয়ালু হইলেও লোকের নিকট সময়ে সময়ে "কঠিন, নির্দ্দয়, নিদারুণ" প্রভৃতি বিশেষণে আপ্যায়িত হন। বস্তুতঃ এ জগতে যিনি যতই রূপবান, গুণবান, ধনবান, বলবান, পুত্রবান, বা সৌভাগ্যবান হউন না কেন, নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আমরা মনে করি সুরপুরবাসী দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য কেহই সুখী নহেন ; কিন্তু যখন তাঁহাকেও দৈত্যভয়ে ভীত হইয়া অমরাবতী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে দেখি, তখন আমাদের সে ভ্রম দূর হয়। ত্রিদশাধিপতি পুরন্দরের যখন এই দশা তখন হেতমপুরাধিপতি রাজা রামরঞ্জন এই পাপ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে অক্ষুণ্ণ সুখভোগ করিবেন— কিরূপেই বা দুঃখের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবেন? ফলতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার নিত্যরঞ্জন অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আদৌ এই সুখের সংসারে দুর্ব্বিসহ শোকানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। সে অনলও নির্ব্বাপিত হইবার নহে, কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইতে না হইতে নৃপতিতনয়া নৃপবালা দেবী হঠাৎ যেন সেই অনলে ফুৎকার প্রদান করিয়া কোথায় অন্তর্হিতা হইলেন। অবশেষে রামরঞ্জনের হৃদয়রঞ্জিনী—একমাত্র সংসার সঙ্গিনী—মহিষীও পার্থিব মায়ামমতা বিস্মৃত হইয়া সেই অনলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন। রাজা বাহাদুর পত্নীশোকে ও রাজকুমারগণ মাতৃশোকে এই সুখের সংসারকে যেন দুঃখের আদর্শস্থল জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আবার একপক্ষ অতীত হইতে না হইতে মহিষীর আদরিণী দুহিতা ভূপবালা দেবী যেন মাতৃশোক সংবরণ করিবার জন্য মাতৃসকাশেই চলিয়া গেলেন।

গৃহবাস পরিত্যাগ করিলেও এই দুঃখরাশি সঙ্গ পরিত্যাগ করে না ; আজীবন অশ্রুসিঞ্চন করিলেও এ অনল নির্ব্বাপিত হয় না ; এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পদার্থ যে প্রাণ তাহা পরিত্যাগ করিলেও পরিত্রাণ নাই, এই জ্বালা বুকে করিয়া পুনরায় সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। তবে কিসে এ দুঃখের শান্তি হয়? অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ বিস্মৃতির চেষ্টায় কেহ সুরাপান করেন, কেহ নৃত্যগীতে রত থাকেন, কেহ নানাবিধ ক্রীড়ায় বা আমোদ আহ্লাদে সময় ক্ষেপণ করেন। কিন্তু যাহা দুঃখের কারণ, এমন সব বিষয় হইতে যদি দুঃখের অবসান হইত, তাহা হইলে ভ্রমান্ধ মানবকে এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সুখান্বেষণ করিতে হইত না— শীতল জল পান করিলেই যদি জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির প্রবল পিপাসার নিবৃত্তি হইত, তাহা হইলে আর ঔষধ সেবনের আবশ্যক হইত না। রাজা রামরঞ্জন এ শ্রেণীর লোক নহেন, তিনি দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ও তত্ত্বজ্ঞানী। তিনি বুঝেন যে ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না

করিলে আর কিছুতেই শান্তি নাই। তাই তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়া ভগবৎপাদপদ্মে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করতঃ বিমল শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। আর সুযোগ্য রাজকুমারগণও পিতৃপ্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করিয়া যিনি যতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন তিনি অতদূর শান্তিলাভের অধিকারী হইয়াছেন।

এ স্থলে রাজপরিবার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর একটি ধারাবাহিক বিবরণ দিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য বিষয়ের অবতরণা করিব।

রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ১২৫৭ সালের ৭ই ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬১ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, এবং ১২৬৮ সালের ৫ই কার্ত্তিক তারিখে তদীয় পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। ১২৭১ সালের ৭ই বৈশাখ তারিখে দ্বারকা গ্রামনিবাসী বাবু কালাচাঁদ রায়ের কন্যা শ্রীমতী পদ্মসুন্দরী দেবীর সহিত রামরঞ্জনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। পিতৃবিয়োগের পর অপ্রাপ্তবয়স্ক রামরঞ্জনের সম্পত্তিসমূহ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে থাকে। ১২৭১ সালের ভাদ্র মাসে তিনি কলিকাতার ওয়ার্ড স্কুলে পড়িতে যান এবং ১২৭২ সালের ভাদ্র মাসে কাশীর ওয়ার্ড স্কুলে প্রেরিত হন। ১২৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি সাবালক গণ্য হন ও ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ তাঁহার সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ও রাজ্য শাসন করিতেছেন।

যিনি পিতৃমাতৃহীন শিশু রামরঞ্জনকে পক্ষপুটে রক্ষিত পক্ষিশাবকের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন রামরঞ্জনের সেই মাতৃস্থানীয়া পিতামহী মন্দাকিনী দেবী ১২৭৭ সালের প্রাবৃটকালে পুণ্যতীর্থ কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় ২৭শে শ্রাবণ তারিখে ৬৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ১২৭৭ সালের ১১ই পৌষ তারিখে রামরঞ্জনের জ্যৈষ্ঠপুত্র কুমার নিত্যনিরঞ্জন, ১২৭৯ সালের ১৪ই আশ্বিন জ্যৈষ্ঠা কন্যা ভূপবালা দেবী ও ১২৮০ সালের ৫ই পৌষ মধ্যম পুত্র কুমার সত্যনিরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হন।[২] ১২৮১ সালে রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক হেতমপুরে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক্ কর্ত্তৃক ১২৮২ সালে রামরঞ্জন "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১২৮২ সালের ১০ই মাঘ তারিখে রাজা রামরঞ্জনের তৃতীয়াত্মজ কুমার মহিমানিরঞ্জন ও ১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে দ্বিতীয়াত্মজা নৃপবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন।[৩] ১২৮৪ সালে রামরঞ্জন "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১২৮৬ সালের ২৫শে কার্ত্তিক রাজা বাহাদুরের চতুর্থ পুত্র কুমার সদানিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৮ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে যশোহর জেলান্তর্গত গোবরডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ভূপবালার বিবাহ হয়। ১২৮৯ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ রাজা বাহাদুরের পঞ্চম পুত্র কুমার কমলানিরঞ্জন, ১২৯১ সালের ১৯শে কার্ত্তিক তৃতীয়া কন্যা রাসবালা দেবী ভূমিষ্ঠ হন। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৮৫, ৫ই মে তারিখে) বীরভূমের প্রাচীন হিন্দু রাজধানী

"রাজনগর" রাজা বাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়– হিন্দু রাজার স্থাপিত রাজ্য অবশেষে হিন্দু রাজার অধিকারে আসিল। ১২৯৩ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে কনিষ্ঠা রাজকুমারী অমিলাবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৩ সালের ১৬ই মাঘ তারিখে, মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত টিয়াকাটা পাট্‌কেবাড়ী গ্রামনিবাসী শ্রীযক্ত বাবু চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত কুমার নিত্যনিরঞ্জনের এবং ১৮ই মাঘ তারিখে হুগলীর অন্তর্গত জনাই গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত কুমার সত্যনিরঞ্জনের বিবাহ হয়। ১২৯৪ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখে উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কুমার ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী নৃপবালা দেবীর বিবাহ হয়। ১২৯৬ সালের আশ্বিন মাসের শেষভাগে রাজা বাহাদুর তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহার সমভিব্যহারে মহিষী পদ্মসুন্দরী দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার নিত্যরঞ্জন ও জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গমন করেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাঁহারা বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হন এবং ১২৯৬ সালের ২২শে কার্ত্তিক তারিখে রাসপূর্ণিমার দিনে বৃন্দাবনে রাসবিহারী জীউ ও অষ্টসখীর কুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বৃন্দাবন হইতে কাশীধামে আগমন করিয়া তথায় স্বনামে "রামরঞ্জনেরশ্বর", পিতৃদেবের নামে "কৃষ্ণচন্দ্রেশ্বর" ও শ্বশুরের নামে "কালাচাঁদেশ্বর"– এই তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] এতদুপলক্ষে তাঁহারা বৃন্দাবনে ও কাশীধামে অকাতরে বহু অর্থব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু, মোহান্ত, সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক ও কাঙ্গালীগণকে প্রচুর অন্ন, বস্ত্র ও অর্থ বিতরণ করেন। অনন্তর অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ; কিন্তু সিঙ্গিয়া [সাঁইথিয়া] ষ্টেসন হইতে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূকে হেতমপুরে পাঠাইয়া দিয়া রাজা বাহাদুর, মহিষী ও নিত্যনিরঞ্জন, এই তিন জন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গমন করেন। কিন্তু কি অশুভ মুহূর্তে–কি কুক্ষণেই– তাঁহারা কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া কুমার নিত্যরঞ্জন অকস্মাৎ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। কলিকাতার অনেক সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ কুমারের জীবন রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলেন কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, সাক্ষাৎ কুমার সদৃশ কুমার নিত্যরঞ্জন তরুণ বয়সে জনকজননী, ভ্রাতাভগিনী ও পত্নীকে বিষম শোকাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ১২৯৬ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ তারিখে দেহত্যাগ করেন। তৎপর দিনেই হেতমপুরে এই অশুভ সংবাদ রাষ্ট্র হইল। হেতমপুরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা শোকে ও দুঃখে হাহাকার করিতে লাগিল, সেদিন কেহ অন্নজল গ্রহণ করিতে পারে নাই।[৫]

কুমার নিত্যরঞ্জনের মৃত্যুর সময় তদীয় পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি ১২৯৭ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে একটি পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত রাজা বাহাদুর ও তদীয় মহিষী পৌত্র-মুখ দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিলেন। রাজপৌত্রের নাম জ্ঞানরঞ্জন।[৫]

অনন্তর ১২৯৮ সালের ২১শে শ্রাবণ তারিখে রাজকুমার সত্যনিরঞ্জনের পুত্র ব্রহ্মরঞ্জন ভূমিষ্ঠ হন। পৌত্রের পর পৌত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া রাজদম্পতি অতিশয় সুখী হইলেন। পরে ১৩০০ সালের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে কুমার সত্যনিরঞ্জনের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম ভানুবালা দেবী। এই বৎসর ৮ই ফাল্গুন তারিখে, ইতিহাসবিখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের বংশধর, কুমার দুর্গানাথ রায়ের কন্যার সহিত কুমার মহিমানিরঞ্জনের শুভ পরিণয়োৎসব সুসম্পন্ন হয়।[৬] উক্ত কুমার দুর্গানাথ রায় মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কুঞ্জঘাটার অধিপতি। ১৩০৫ সালের ১লা ফাল্গুন তারিখে তাঁহার অন্যতমা কন্যার সহিত কুমার কমলানিরঞ্জনের বিবাহ হয়।

দ্বিতীয়া রাজকুমারী নৃপবালা দেবীর যথাক্রমে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের নাম পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও কন্যার নাম ব্রজরাণী। ব্রজরাণী ১৩০১ সালের পৌষ মাসে ভূমিষ্ঠ হন। ১৩০২ সালের আষাঢ় মাসে নৃপবালা দেবী পীড়িতা হইয়া হেতমপুরে আগমন করেন এবং ২৮শে আষাঢ় তারিখে মৃত্যুমুখে পীড়িত হন।

১৩০২ সালের ফাল্গুন মাসে (দোল পূর্ণিমার দিন) রাজা বাহাদুর "রঞ্জন" প্রসাদের অনতিদূরে গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] ১৩০৩ সালের ২২শে বৈশাখ তারিখে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত কুমার সদানিরঞ্জনের এবং ২৮শে বৈশাখ তারিখে গঙ্গাতীরবর্ত্তী মেটিয়ারী গ্রামের সুবিখ্যাত রামদাস বাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী রাসবালার বিবাহ হয়। পর বৎসর অর্থাৎ ১৩০৪ সালের ২৭শে আষাঢ় তারিখে যশোহর জেলান্তর্গত নলডাঙ্গার অধিপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ ভূষণ দেব রায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পন্নগ ভূষণ দেব রায়ের সহিত কনিষ্ঠা রাজকুমারী অমিলাবালা দেবীর বিবাহ হয়। ১৩০৭ সালের ১৩ই কার্ত্তিক কুমার সদানিরঞ্জনের কন্যা প্রমোদবালা জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১০ সালের ২৯শে বৈশাখ তারিখে উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজপৌত্রী ভানুবালা দেবীর বিবাহ হয়। ১৩১১ সালের ১২ই ভাদ্র কুমার কমলানিরঞ্জনের পুত্র বিশ্বরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন।

পুত্র, দুহিতা, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতির জন্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ উপলক্ষে রাজা বাহাদুর হেতমপুরবাসী প্রজা ও যাবতীয় রাজকর্ম্মচারিগণকে অলঙ্কার, বস্ত্র, বাসন, তৈল, হরিদ্রা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিতরণ করেন এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতিকেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করাইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন পূজা পর্ব্ব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রতিনিয়ত হইয়া থাকে।

জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী ভূপবালা দেবীর সন্তানাদি না হওয়ায় রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর অন্তঃকরণে দারুণ দুঃখ হইয়াছিল। অনেক দিন পরে ১৩১২ সালের শেষভাগে রাজকুমারীর গর্ভলক্ষণ লক্ষিত হইল। তদ্দর্শনে মহিষীর আনন্দের সীমা রহিল না। ভূপবালা দেবীর সন্তান হইবার কোনও আশা ছিল না, কিন্তু তিনি গর্ভবতী হওয়ায়

জনকজননীর নিরাশ অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। তজ্জন্য ভূপবালা দেবী (১৩১৩ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে) একটি কন্যা প্রসব করিলে নবকুমারীর "আশালতা" নাম রাখা হইল। কিন্তু কেহ স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যিনি এই আশালতার মুখ দেখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সুখিনী হইতেন, তিনি সহসা মরজগত পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রস্থান করিবেন। ১৩১৩ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে ভূপবালা কলিকাতায় গমন করেন এবং ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে আশালতার জন্ম হয়। এ দিকে ৫ই অগ্রহায়ণ তারিখে রাত্রি প্রায় ১১।৩ [১১.৩০ মি.] ঘটিকার সময় হৃদরোগে[ক] হঠাৎ রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর মৃত্যু হয়।[খ] মহিষীর প্রাণের আশা মিটিয়াও মিটিল না, নবকুমারীর জন্ম সংবাদ পাইয়াও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভূপবালার কন্যা হইয়াছে শুনিয়া সকলেই যেমন আনন্দিত হইয়া ছিলেন, রাজমহিষীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহারা তেমনি দুঃখার্ত্ত হইলেন। কুমার সত্যনিরঞ্জন ও সদানিরঞ্জন তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন সুতরাং কুমার মহিমানিরঞ্জন মাতৃদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মহিষীর মৃতদেহ সৎকারার্থ ভাগীরথীতীরে প্রেরিত হইল।

রাজা রামরঞ্জন পত্নীশোকে ও রাজকুমারগণ মাতৃশোকে কাতর, ইতিমধ্যে কলিকাতা হইতে হঠাৎ সংবাদ আসিল যে ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখে ভূপবালা দেবী সূতিকারোগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজপরিবার এইরূপ উপর্য্যুপরি শোকপ্রাপ্ত হইয়া ম্রিয়মান হইলেন।

ধনাঢ্য পরিবারের স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ বস্ত্রালঙ্কার, আহার বিহার প্রভৃতি বিলাসবিভ্রম লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মহিষী পদ্মসুন্দরী সে শ্রেণীর স্ত্রীলোক ছিলেন না। তাঁহার দেবীমূর্ত্তি দেখিলেই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা বলিয়া বোধ হইত। তিনি একদিকে যেমন বুদ্ধিমতী অন্যদিকে তেমনি গুণবতী ছিলেন। রাজসংসারের প্রত্যেক কার্য্যই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতেন, কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণকে উপযুক্ত শাসনে রাখিতেন। আবার স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি যে সমস্ত সৎকার্য্য সাধারণের উপকারার্থে রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাও মহিষীর যত্নেই হইয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহারই আন্তরিক যত্নে কলেজ স্থাপিত ও স্বীয় শ্বশুড় কৃষ্ণচন্দ্র বাবুর নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া "কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ" নামে পরিচিত।[৯] এই ধর্ম্মপ্রাণা মহিষীর আন্তরিক অনুরাগে হেতমপুরে "গৌরাঙ্গ ভবন" ও বৃন্দাবনে "অষ্ট সখীর কুঞ্জ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তজ্জন্য রাজা বাহাদুর উক্ত দুই স্থলে এই গুণবতী ভার্য্যার দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১৩১৫ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখে ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে রাজপৌত্র জ্ঞানরঞ্জন ও ব্রহ্মরঞ্জনের পরিণয়োৎসব মহা ধুমধামে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ছোটলাট বাহাদুর ও কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে "কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ" রাণী পদ্মসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তজ্জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিগত ১৩১৬ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বীরভূমের ম্যাজিষ্টেট সাহেব বাহাদুর আহূত হইয়াছিলেন। এবং তৎকর্ত্তৃক স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছিল।[১০]

১৩১৬ সালের ৬ই ফাল্গুন তারিখে খানাকুল কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায়ের সহিত রাজপৌত্রী প্রমোদবালা দেবীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। একদিকে সারস্বতোৎসব অন্যদিকে বিবাহোৎসব, উভয়বিধ উৎসবের সংমিলনে হেতমপুরে কয়েক দিন অবিশ্রান্ত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

ক. কুমার নিত্যনিরঞ্জনের এই আকস্মিক মৃত্যু উপলক্ষে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসমূহে যে শোক-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা পরিশিষ্টাংশে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

খ. ১২৬০ সালের ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। [১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুন]

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারগণ।

রাজকুমারগণের বিষয় লিখিতে গিয়া প্রথমেই দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতে হইতেছে, ইহা বড়ই দুভার্গ্যের বিষয়। ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে– রাজা রামরঞ্জনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী তরুণ বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া জনকজননী ও হতভাগিনী পত্নীকে বিষম শোকসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। কুমারের আকস্মিক মৃত্যু হইলে সংবাদপত্রসমূহে যে শোকসংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নে একটি উদ্ধৃত হইল। কুমার নিত্যনিরঞ্জন কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, পাঠকগণ এতৎ পাঠেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। "বেদব্যাস" নামক মাসিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত শোককাহিনী প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

"হিতমপুরের রাজপরিবারের বড়ই শোচনীয় সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। স্বধর্ম্মনিরত, সাধু হৃদয় রাজা শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের অতীব প্রিয়ভাজন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শ্রীমান্ নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অকস্মাৎ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমরা এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় নিতান্তই শোক সন্তপ্ত হইয়াছি। কুমারের সদ্‌গুণাবলী স্মরণ করিয়া আমরা কিছুতেই শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। মৃত কুমারের চরিত্র এতই সদ্‌গুণে ভূষিত ছিল যে যিনি তাঁহার সহিত একবার মাত্র আলাপ করিয়াছেন তিনি তাঁহাকে আর ইহ জীবনে ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই অল্প বয়সে তাঁহার দীর্ঘায়তন, তাঁহার বিচক্ষণতা, তাঁহার বহুদর্শীতা ও ধর্ম্মপ্রবণতা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইত। তাঁহার কমলহৃদয় সর্ব্বদা অকপট দয়ায় বিগলিত থাকিত। তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিতে বসিলে তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, মিষ্টভাষিতায় ও সৌজন্যতায় এতই মন মুগ্ধ হইত যে তাঁহার সহবাস ছাড়িতে ইচ্ছা হইত না। তিনিও সদ্‌সঙ্গ পাইলে শীঘ্র তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। প্রজাবর্গের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে হাহাকার করিতেছে। সকলের মুখেই এই এক কথা যে আমরা "মা বাপ" একসঙ্গে হারাইলাম। শুনিলাম তিনি এই অল্প বয়সে প্রজাগণের এতই প্রিয়ভাজন হইয়াছিল যে উহারা তাঁহাকে দর্শন করিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিত। বৎসরাধিকমাত্র হইল পিতা, পুত্রের প্রতি রাজকার্য্যের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছিলেন। কুমার বিষয় কর্ম্মের পর্য্যবেক্ষণ ভার

পাইয়া অবধি অসাধারণ ধীরতা ও উৎসাহের সহিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার ন্যায় বিচারে বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিল এবং ভাবী সুখের আশায় উৎফুল্লিত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্ব সাধারণের মনাকর্ষণ করিয়া বিগত ২৮শে আশ্বিন শুভদিনে দৈবকার্য্য অনুষ্ঠান মানসে পিতা মাতা ও সহধর্ম্মিনীকে সঙ্গে লইয়া কাশী ও বৃন্দাবনধাম গমন করেন। বৃন্দাবনে একটী বৃহৎ দেবালয় নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় নানাবিধ সুবর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া অষ্টসখিসহ রাসবিহারী মূর্ত্তি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠাকার্য্যে [তিনি] প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রজবাসিদিগকে ১।০ পাঁচ পোয়া ওজনের একটি করিয়া লাড্ডু ও তৎসহ একটি করিয়া আধুলি দেওয়া হয়।[২] বৈষ্ণবদিগকে এক খানি করিয়া সুন্দর বহির্ব্বাস ও অন্ধ ও আতুরদিগকে আটহাত পরিমিত বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আট দশ হাজার কাঙ্গালীকে দুই আনা করিয়া দান করেন এবং অবশেষে সুচারুরূপে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহা ব্যতীত তথায় প্রত্যহ ৩০ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের সুবন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন এবং রাসবিহারী দেবের ভোগ ও শীতলের সুচারু বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপর কাশীধামে আসিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের ঠিক উপরেই একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় দেবাদিদেব মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই প্রতিষ্ঠা কার্য্য সময়ে নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় উপস্থিত ছিলাম। এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নগদ ৬ ছয় টাকা করিয়া বিদায় দেওয়া হয় এবং ২০০০ দুই সহস্রেরও অধিক ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ অতি উপাদেয় আহারীয় দ্বারা ভোজন করাইয়া পরিতোষ করেন ও প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আন্দাজ্ ১ এক টাকা মূল্যের একটি করিয়া লোটা (পশ্চিমদেশীয় বড় ঘটি) দান করেন। আমরা সেই সময় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মুখে বলিতে শুনিয়াছি যে "রাজকুমার যে কার্য্য করিলেন ইদানীং বাঙ্গালীর মধ্যে কোন বড় লোক এরূপ উচ্চদরের সদ্ব্যয় কাশীতে করিয়া যান নাই"। তৎপর সন্ধ্যার সময় হইতে কাঙ্গালী বিদায় আরম্ভ করিয়া রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত প্রায় ৫।৬ হাজার কাঙ্গালীকে ১১ আনা দান করিয়া দান করেন। আমরা দেখিয়াছি স্বয়ং রাজকুমার সেই অজস্র জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রত্যেক কাঙ্গালীর গাত্রে হাত বুলাইয়া প্রীতি সম্ভাষণে তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় সমস্ত দিবস উপবাস থাকিয়া স্বয়ং পরিবেশন করিয়া সকলকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাঁহার সেই সর্ব্বদা হাস্য মুখ, প্রফুল্লিত অন্তর ক্রমান্বয় বিষম পরিশ্রমেও কিছুমাত্র কাতর ভাব প্রকাশ করে নাই, বরং আরও যেন সে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাঙ্গালী বিদায় যখন শেষ হইল তখন তিনি একটু দুঃখিত হইয়া বলিলেন "কৈ, আর কি কাঙ্গালী নাই? আমার ইচ্ছা ছিল সমস্ত রাত্রি এইরূপ কাঙ্গালী বিদায় করিয়া আনন্দে কাটাইব। দেখ চারিদিক দেখ আর কেহ বাকী আছে কি না?" এই বলিয়া নিজেই ব্যস্ত হইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিলেন। সে ভাব সে মনমুগ্ধকর ভাব যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন।

তাঁহার ভীম সদৃশ আকৃতি, সুন্দর, সুঠাম কলেবর এবং শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডল যখন সেই অজস্র জনতা ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, তখন সমস্ত লোক বিদায়ী ফেলিয়া অচলভাবে ও নির্নিমেষে তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিল। আমরা ভরসা করি, আগামী বারের বেদব্যাসে কুমারের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিব। আমাদের বিশ্বাস পাঠকগণ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার এই অল্প বয়সে এইরূপ অসামান্য রূপে ও গুণে নিশ্চয়ই বিস্মিত হইবেন।

কুমার এইরূপে নানা সদনুষ্ঠান করিয়া বড়লাট সাহেবের লেভিতে যোগদান মানসে হতভাগিনী ভার্য্যাকে গৃহে প্রেরণ করিয়া পিতা মাতা সহ কলিকাতায় আইসেন। এখানে কএক দিন থাকিলে পর অকস্মাৎ গত ২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার (লেভির দিন) রাত্রিশেষে বিষম বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।[৩] প্রথম হইতেই কলিকাতার সুযোগ্য ডাক্তারগণ নানাবিধ উপায়ে ও যত্নে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছুই হইল না। তাঁহদের সমস্ত যত্ন পণ্ড হইল। রাজা হউন আর দরিদ্রই হউন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইলে, কাহার সাধ্য তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করে? তৎপরদিবস বুধবার ২৭শে অগ্রহায়ণ রাত্রিশেষে অর্থাৎ ঠিক ২৪ ঘন্টার মধ্যেই রাজকুমার নিত্যনিরঞ্জন রোরুদ্যমান পিতামাতাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া নিত্যধামে চলিয়া গেলেন। মা অন্নপূর্ণা বুঝি তাঁহার পবিত্র আত্মা পাছে সংসারের মলিনতায় কলুষিত হয় এই আশঙ্কায় আপনার প্রিয় সন্তানকে স্বীয় পবিত্র ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। মৃত্যুকালীন কুমারের সে প্রশান্ত, গম্ভীর অথচ স্মিতভাব দেখিয়া প্রকৃতই ইহাই প্রতীত হইয়াছিল। এরূপ কঠিন পীড়া ভোগ করিয়াও তাঁহার শরীরের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই। মনে হইল কুমার যেন সমাধিস্থ হইয়া নিজ আরাধ্য দেবতার ধ্যানে নিমগ্ন। আহা! সে ভাব সে সময়েও পরম রমণীয় বোধ হইয়াছিল।

যখন কুমারের ত্যক্ত সেই কান্তিপূর্ণ দেহ সৎকারার্থ ভাগীরথীতীরে লইয়া যাওয়া হয় তখন পথপার্শ্বস্থ যাবতীয় লোক হাহাকার করিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছিল যে "ওরে কাহার সর্ব্বনাশ করিলে রে! ওরে কোন্ আকাশের চাঁদ ভাঙ্গিয়া পড়িল রে! তোর হতভাগিণী মার কি দশা করিলি রে।" ইত্যাদি।

কুমারের সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার জীবনের এই স্বল্পকাল মধ্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা চিরস্মরণযোগ্য। আমাদের ইচ্ছা আছে, আমরা সময়ে তাঁহার জীবন চরিত প্রকাশ করিব। তাহাতে পাঠক দেখিবেন বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর গৃহে বিশেষতঃ বাঙ্গালী রাজা জমিদারের গৃহে এরূপ অসামান্য গুণ সম্পন্ন বালক অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমরা বিশেষরূপে কুমারের হৃদয় অবগত ছিলাম। তাঁহার হৃদয়ে এমন অনেক সাধু অনুষ্ঠানের সংকল্প পোষিত ছিল. যাহা অল্পকাল মধ্যেই কার্য্যে পরিণত হইত। দীন-দরিদ্রের প্রতি দয়া, বিপন্নকে আশ্রয় দান ও সাধুজনের প্রতি সদয় ব্যবহার তাঁহার নিত্যধর্ম্ম ছিল। তাঁহার কথায় ও উৎসাহে আমাদের ভরসা হইয়াছিল যে তিনি বাঁচিয়া

থাকিলে আমাদের সমাজের প্রার্থনীয় অনেক সদনুষ্ঠান সংসাধিত হইবে। কিন্তু হায়! কাল তাহাতে বিরোধী হইল। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা-রহস্য মানবের সাধ্য কি যে ভেদ করে। এখন আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারকে অনুরোধ করি যে তাঁহারা কুমার নিত্যনিরঞ্জনের প্রদর্শিত সৎপথ অনুসরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিহ্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন।"

অন্যান্য সংবাদপত্রের কথাও এইরূপ, সুতরাং সে সকলের উল্লেখ অনাবশ্যক। অতঃপর বর্ত্তমান রাজকুমারগণের বিষয় বলা আবশ্যক। বর্ত্তমান রাজকুমারগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী না হইলেও সকলেই বুদ্ধিমান ও কার্য্যকুশলী, কুমার সত্যনিরঞ্জন আইন সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন ও কূটতর্কের সুন্দর মীমাংসা করিতে সক্ষম। রাজষ্টেট সম্বন্ধীয় কোনও গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি তাহা সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি রাজষ্টেটের সকল বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং কিছুদিন অনারেরি ম্যাজিষ্টেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে তিনি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর আছেন। উল্লিখিত কার্য্যসমূহ তিনি অতিশয় প্রশংসার সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। যিনি যেরূপ লোক, কুমার সত্যনিরঞ্জন তাঁহার সহিত তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পিতা যেমন সন্তানের দোষ দেখিয়া রুষ্ট ও গুণ দেখিয়া তুষ্ট হন, তদ্রূপ তিনি কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণের দোষ দেখিলে উহা সংশোধনার্থ সামান্যরূপ দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন এবং গুণ দেখিলে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। তাঁহার সহৃদয়তারও বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। দীন দুঃখীর দুঃখ দেখিলে তিনি দয়াপরবশ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা মোচন করেন। এজন্য তিনি সময়ে সময়ে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

কুমার সত্যনিরঞ্জন অশ্বারোহণে অতিশয় সুনিপুণ এবং গাড়ী ঘোড়ায় তাঁহার অত্যন্ত সখ। ভাল ভাল অশ্ব, হস্তী, গাভী প্রভৃতি পাইলে তিনি অতিশয় উচ্চমূল্য দিয়াও গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন সর্ব্ববিধ কলকারখানায় তাঁহার উত্তমরূপ অভিজ্ঞতা দেখিতে পাওয়া যায়। বাইসিকেল, মটরগাড়ী, ঘোড়ারগাড়ী, ইলেক্‌ট্রীক লাইট, গ্যাস লাইট প্রভৃতির কলকব্জা খারাপ হইলে তিনি মিস্ত্রী ও কারিকর লইয়া সুন্দররূপ মেরামত করিয়া থাকেন। সুশিক্ষিত মিস্ত্রী ও কারিকরগণ তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে।

রাজা বাহাদুরের তৃতীয়াত্মজ কুমার মহিমানিরঞ্জন সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি কার্যতৎপর যেমন ন্যায়পরায়ণ তেমনি ধার্ম্মিক। তাঁহারই লিপিচাতুর্য্যে রাজষ্টেটের যাবতীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মচারীগণ পরিচালিত [হয়]। জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য বুঝিতে তিনি অদ্বিতীয়। কিছুদিন হইল তিনি রাজষ্টেটের নিয়মাবলী সম্বন্ধীয় যে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেন্টের সার্কুলার অর্ডার বা রুলস্ রেগুলেশন্‌স অপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। এই পুস্তকে রাজষ্টেটের ম্যানেজার

লিগেল মেম্বার হইতে সামান্য পেয়াদা ও ভৃত্যগণের কার্য্যের নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কুমার মহিমানিরঞ্জন ইং ১৮৯৯ হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত বীরভূম ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন এবং উক্ত বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কিছুদিন লোকেল বোর্ডের চেয়ারম্যান, কিছুদিন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও কিছুদিন অনারেরি ম্যাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অতি প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য্যসমূহ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কুমার মহিমানিরঞ্জন যেরূপ বিদ্যোৎসাহী, মাতৃভাষার প্রতি তদ্রূপ অনুরাগী। কি কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, কি ন্যায়, দর্শন, পুরাণ, কি ধর্ম্ম শাস্ত্র, কি সঙ্গীত শাস্ত্র, সকল বিষয়েই সকল শাস্ত্রেই তাঁহার কিছু না কিছু ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা লক্ষিত হয়। কিছুদিন হইল, তাঁহার যত্নে হেতমপুরে একটি নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছিল, তথায় তাঁহার রচিত বহুবিধ সুন্দর গীতিনাট্যের অভিনয় হইত। তন্মধ্যে "কিশোরী-মিলন" ও "রমাবতী" নামক দুইখানি নাটক ও "চিত্রগুপ্ত" নামক একখানি প্রহসন মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত কত যে ক্ষুদ্র কবিতা ও গান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।[ক]

কুমার মহিমানিরঞ্জন অতিশয় পিতৃমাতৃভক্ত। তিনি জানেন, জগতে পিতামাতাই প্রত্যক্ষ দেবতা। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃস্নান সমাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতার পদ বন্দনা না করিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন না। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "কিশোরী মিলন" নাটক মাতৃপদে ও "রমাবতী" নাটকখানি পিতৃপদ উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

ইতিহাসে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। রাজা বাহাদুর তাঁহারই আগ্রহাতিশয় দর্শন করিয়া গত বৎসর (১৩১৫ সালে) সংবাদপত্রসমূহে এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন যে যিনি এক বৎসরের মধ্যে বীরভূমের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা করিবেন, তিনি দুই শত টাকা পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু এ কার্য্যে কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া, কুমার মহিমানিরঞ্জন স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। তৎপ্রণীত উক্ত ইতিহাসের একখানি "বীরভূমের রাজবংশ" নামে মুদ্রিত হইতেছে, অপর একখানি "বীরভূম বার্ত্তা", নামক স্থানীয় সংবাদপত্রে "বীরভূমের প্রাচীন কাহিনী" নামে প্রকাশিত হইতেছে, ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।[খ]

কুমার মহিমানিরঞ্জনের বিদ্যানুরাগিতা সম্বন্ধে এ স্থলে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। তিনি হেতমপুর রাজবাড়ীতে "রঞ্জন লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই পুস্তকাগারে সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষায় বহুবিধ পুস্তক সংরক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত পুস্তকের অধিকাংশই বাঙ্গলা পুস্তক। এই লাইব্রেরী পূর্ণ করিতে কুমার বাহাদুর অত্যন্ত চেষ্টা ও প্রভূত অর্থব্যয় করিতেছেন।

কুমার মহিমানিরঞ্জন যেমন সদ্বিবেচক তেমনি সুবিচারক, এবং যেমন গুণবান, তেমনি গুণগ্রাহী। তিনি কোনও কার্য্য ভালরূপ বিবেচনা ও বিচার না করিয়া সম্পন্ন

করেন না, সুতরাং তাঁহার ন্যায় বিচারে কি কর্ম্মচারী, কি ভৃত্য, কি প্রজাগণ, সকলেই সন্তুষ্ট। তিনি একদিকে যেমন সর্ব্ববিধ গুণের আধার স্বরূপ, অপরদিকে গুণের ও গুণিগণের তদ্রূপ আদর করিয়া থাকেন।

রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর স্বর্গারোহণের সময় অন্যান্য রাজকুমারগণ গৃহে উপস্থিত ছিলেন না সুতরাং মাতৃভক্ত কুমার মহিমানিরঞ্জন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং এরূপ সযত্নলালিত ও সুখাভ্যস্ত হইয়াও এক বৎসরকাল কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি সর্ব্ববিধ ভোগবিলাস ও আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন পর্য্যন্ত তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন না। এখন ধর্ম্মালোচনা ও বিদ্যালোচনা তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্যে পরিণত হইয়াছে। রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বাসরে রাজা বাহাদুর সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ-ভোজন করান ; তৎপরে কুমার মহিমানিরঞ্জন স্বয়ং বৃন্দাবনধামে গমন করিয়া তত্রত্য সাধু ও বৈষ্ণবগণকে অর্থ, অন্ন ও বস্ত্র বিতরণ করেন।

দুঃখের বিষয়, কুমার মহিমানিরঞ্জনের এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই ; তজ্জন্য তাঁহার কিছুমাত্র মনোবিকার পরিলক্ষিত হয় না। যিনি জীবের অভাব হইবার পূর্ব্বেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা করেন, সেই সৃষ্টিকুশলী বিধাতা কুমারের এই অভাব অচিরে পূর্ণ করুন।[গ]

কুমার সদানিরঞ্জন ও কমলানিরঞ্জন তরুণবয়স্ক যুবাপুরুষ হইলেও উভয়েই বুদ্ধিমান ও কার্যতৎপর। তাঁহারা এক একজন এক বিভাগের কায্যসমূহ পরিদর্শন করেন। কুমার সদ্যনিরঞ্জন অত্যন্ত সদালাপী ও মিষ্টভাষী। তাঁহার সদাহাস্যপ্রদীপ্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় শীতল হয়, তাঁহার মধুরালাপে মন মুগ্ধ হয়।

কুমার কমলানিরঞ্জন এখন অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন। ইনিও কুমার মহিমানিরঞ্জনের ন্যায় অতিশয় সঙ্গীতানুরাগী। হেতমপুরে যে একটী সখের যাত্রার দল আছে, কুমার কমলানিরঞ্জন তাহার পৃষ্ঠপোষক।

রাজপৌত্র জ্ঞানরঞ্জন ও ব্রহ্মরঞ্জন পরস্পর এমনি সদ্ভাব সম্পন্ন, যেন তাঁহারা এক বৃন্তে দু'টি ফুল। তাঁহাদের সরল ভাব দেখিলে হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়। ইঁহারা এখন বিদ্যাধয়নে যত্নশীল।

প্রভূত বিভবশালী হইয়াও এই রাজবংশ সতত নিরহঙ্কারী ও নিরভিমানী এবং স্বধর্ম্মনিরত ও পরোপকারী। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই রাজবংশের সর্ব্বদা মঙ্গল বিধান করুন।

ক. এই কবিতা ও গানগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।[ঘ] আপাততঃ এই পুস্তকের পরিশিষ্টভাগে দুই একটি প্রকাশিত হইল।

উপসংহার।

ছোটতরফ।

এতক্ষণ কেবল "বড় তরফ" বা বর্ত্তমান রাজবংশেরই বিষয় আলোচিত হইল। অতঃপর "ছোট তরফের" বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া এই পুস্তকের উপসংহার করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ও কুচিল চক্রবর্ত্তী পরস্পর পৃথক হইলে এই বংশে দুইটি শাখার উৎপত্তি হয়। রাধানাথের বংশধরগণ "বড় তরফ" ও কুচিলের বংশধরগণ "ছোট তরফ" নামে পরিচিত।

কুচিল চক্রবর্ত্তীর চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রগণের নাম রামদয়াল, রামতনু, বেণীমাধব ও রামকৃষ্ণ এবং কন্যাগণের নাম ধনমণি, কস্তুরীমণি, প্যারীমণি, হরমণি ও ধীরমণি।[ক]

বেণীমাধবের চারি পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রগণের নাম রাজবল্লভ, কালাচাঁদ, নবীন ও প্রসন্ন এবং কন্যাগণের নাম গগনমণি, সুকুমারী, মেনকাসুন্দরী ও মনোমোহিনী।

রাজবল্লভের ছয় পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম ক্ষুদিরাম, চিন্তামণি, মহেন্দ্র[১], হরিশরণ, আশুতোষ ও শিবচন্দ্র এবং কন্যাদ্বয়ের নাম তারিণীমণি[২] ও আনন্দময়ী।

ক্ষুদিরামের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম ভক্তিভূষণ এবং কন্যাত্রয়ের নাম পার্ব্বতী, লাবণ্যময়ী ও শৈলেশ্বরী।

চিন্তামণির এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম বাগাল এবং কন্যাদ্বয়ের নাম গৌরমণি ও ভোলাদাসী।

মহেন্দ্র নারায়ণের দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম গৌরসুন্দর ও বাদল এবং কন্যাত্রয়ের নাম সাবিত্রী, সতী ও অন্যটি শিশু।[৩]

হরিশরণের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম শান্তিরাম এবং কন্যাত্রয়ের নাম রামমণি[৪], লাবণ্যময়ী ও জপেশ্বরী।

আশুতোষ বাবুর তিন পুত্র ও চারি কন্যা। পুত্রত্রয়ের নাম কালিদাস, সত্যকিঙ্কর ও হরিবোল এবং কন্যাগণের নাম ষষ্ঠিমণি, সুরধনী, শরৎ-বাসিনী ও সুবাসিনী।[৫]

শিবচন্দ্রের চারি পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রগণের নাম পঞ্চানন, ধর্ম্মদাস, পরমানন্দ ও গোঁসাইদাস এবং কন্যাটি শিশু।

বেণীমাধব বাবুর অপর পুত্র কালাচাঁদের এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রের নাম নীলমণি এবং কন্যাদ্বয়ের নাম মাতঙ্গিনী ও সুখদাসুন্দরী।

নীলমণি বাবুর তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রত্রয়ের নাম পূর্ণচন্দ্র, পচন ও কৃষ্ণগোপাল এবং কন্যাগণের নাম কুড়নমণি, ননীবালা, মঙ্গলবালা, বিমলা ও অন্যটি শিশু।[৬]

কুচিল চক্রবর্ত্তীর অপর পুত্র রামকৃষ্ণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম গোপীবল্লভ ও ছকড়ি এবং কন্যাদ্বয়ের নাম থাকসুন্দরী ও মর্ম্মসখী।

গোপীবল্লভের এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম দুর্গাদাস এবং কন্যাত্রয়ের নাম রামপ্রিয়া, অক্ষয়কুমারী ও দক্ষবালা।

দুর্গাদাস বাবুর চারি পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম হরিপদ, কমলাপদ, অভয়াপদ ও উমাপদ, এবং কন্যাদ্বয়ের নাম অচিন্তাময়ী ও রাধামণি।

রামকৃষ্ণ বাবুর অপর পুত্র ছকড়ি বাবুর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম গুরুদাস, হরিদাস ও বৈদ্যনাথ এবং কন্যাদ্বয়ের নাম রাজলক্ষ্মী ও পূর্ণলক্ষ্মী।

গুরুদাসের এক পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পুত্রের নাম পাতু ও কন্যাগণের নাম গতিদায়িনী, পাঁচুদাসী, হারাদাসী, আর-নাকালী ও অপর্ণা।[৭]

বৈদ্যনাথের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম ধ্বজাধারী ও বংশীধারী এবং কন্যাদ্বয়ের নাম ননীবালা ও তারাদাসী।[খ]

এক্ষণ দেখা যাইতেছে যে কালক্রমে বহু-বংশবিস্তার হেতু "ছোট তরফ" বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া, বর্ত্তমানকালে সামান্য সামান্য গৃহস্থে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক, ছোট তরফের বর্ত্তমান বংশধরগণ রাজা বাহাদুরের সম্পূর্ণ অনুগত। রাজা বাহাদুরও আত্মবংশজ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অধুনা প্রায় সকলকেই যোগ্যতা অনুসারে রাজষ্টেটের কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বজনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছেন।

ছোট তরফের ক্ষুদিরাম বাবু একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পারসী [ফারসি] ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন এবং কিছু দিনের জন্য রাণীগঞ্জের বেঙ্গল কোল্ কোম্পানির জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের কার্য্য করিয়াছিলেন। ক্ষুদিরাম বাবু একজন স্বভাব কবি ছিলেন এবং "পুষ্পাঞ্জলি" নামক একখানি সুন্দর কবিতাপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই পুস্তকের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয় ; পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ আর সম্পূর্ণ ও মুদ্রিত হইল না। তিনি "ভক্তি উপহার" নামক যে একটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া বর্ত্তমান হেতমপুরাধিপতি রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরকে উপহার দিয়াছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল :–

"ভক্তি উপহার।"

শ্রীরাধাবল্লভব পদে মানস মধুপ যাঁর।
নিমগণ, জ্ঞান যাঁর হরিপাদপদ্মসার।।
যাঁর চিত্ত সদা শুদ্ধ ভক্তি-প্রসুন সুবাসে।
পুঞ্জ পুণ্যফলে যাঁর গোকুল-আনন্দ বাসে।।
জন-পালয়িতা সেই দীনদুঃখহারী ভূপ।
দুর্ব্বাদলশ্যাম রাম যেন গৌর রামরূপ।।
প্রতিছত্র-আদি দ্বি অক্ষরে রাম নরপতি।
উপান্তে তৃতীয় কান্ত বামে শোভে রামসতী।।
সম্বরি মরতলীলা লভেছ আরাম রাম।
রামশূন্য করি মাতঃ গিয়াছ অমরধাম।।
তথাপি বিরাজে রাজ দম্পতিরূপ সুষমা।
কিঙ্কর মানসে সেই রামসনে রামরমা।।

ক্ষুদিরাম বাবুর অন্যতম ভ্রাতা আশুতোষ ও শিবচন্দ্র বাবু উভয়েই সুকবি। তাঁহাদের রচিত অনেক কবিতা ও গান আছে।[৮]

ছোট তরফের দুর্গাদাস বাবু একজন সুশিক্ষিত গায়ক। তৎপুত্র হরিপদ ও কমলাপদ ততদূর শিক্ষিত না হইলেও উভয়েই বেশ গান করিতে পারেন।

এই পুস্তকের পরিশিষ্টে একখানি বংশপত্রিকা দেওয়া হইল।[৯] পাঠক তাহাতে দেখিবেন, মুরলীধর চক্রবর্ত্তী এখানে যে বংশ-তরু রোপণ করিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে তাহার কিরূপ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে।

আমরা এইখানেই হেতমপুর কাহিনীর উপসংহার করিলাম। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে এই প্রথম সংস্করণ অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে রচিত হইল। অতঃপর আরও কোনও বিষয় জানিতে পারিলে, উহা পরবর্ত্তী সংস্করণে স্থান পাইবে।[১০]

ক. এখনও যাহাদের নামকরণ হয় নাই তাহাদিগকে শিশু বলিয়া উল্লেখ করা হইল।
খ. পরিশিষ্টে বংশপত্রিকা দ্রষ্টব্য।[১১]

পরিশিষ্ট

[ক] শ্রীযুক্ত রাজা রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের স্বরচিত চারিটী গীত :–

[১]

জয় নিত্যানন্দ গোকুলচন্দ্র জয় জয় জগতারণ।
তুমি জগত পালক ব্রজেন্দ্র বালক সৃজন পালন কারণ।।
বেদাগমে তব নাহিক হে অন্ত, তুমি চিদানন্দ রূপ অচ্যুত অনন্ত,
আমি পাপমতি মায়াঘোরে ভ্রান্ত কর শান্ত হে নারায়ণ।।
সেই বৃন্দাবনের রাখালগণ সনে, যে বেশে তুমি যেতে গোচারণে,
সেই সে সুঠামে, রাধায় লয়ে বামে যুগলে দাও দরশন ;
নাহি চাই ধন নাহি চাই জন, তব অভয় পদে এই আকিঞ্চন,
করেতে মুরলী ধর বনমালি, কর "রাধা রাধা" রবে বাদন।।

[২]

দেখা দাও হরি, গোলক বিহারী এই অভাজনে করি করুণা।।
সর্ব্বদা অস্থির তিল নহে স্থির তব পদে মন ধায় না।।
না জানি ভজন আমি মুঢ়মতি, দয়া কি হবে না অধমের প্রতি,
ওহে শ্রীপতি—
করি নিজগুণে দয়া, দাওহে পদছায়া (আমি) অন্য ধন কিছু চাইনা।।
তুমি সারাৎসার সর্ব্ব মুলাধার [মূলাধার] তোমারে ভজিতে কি শক্তি আমার,
আমি দুরাচার —
একবার কমল আসনে, কমলার সনে, কমলায় কি দেখা দিবে না।।[১]

[৩]

কীর্ত্তন

শ্যাম বামে শোভে কিবা রাধা বিনোদিনী।
নবীন মেঘেতে যেন স্থিরা সৌদামিনী।।
(রূপের বালাই যাইরে যুগল রূপের বালাই যাইরে)
(এমন রূপ ত কভু দেখি নাই, রূপের বালাই যাইরে)

শ্যামের অধরে মোহন বাঁশী, শিরে মোহন চূড়া।
রাই শিরে দোলে বেণী তায় গুঞ্জবেড়া।।
(কেউ ঊন নয়রে, যেমন রাধা তেমনি শ্যাম)
শ্যামের গলে দোলে বনমালা কোটীতে পীতবসন।
ভব পারাবারের ঐ রাতুল চরণ।।
(ভব পারের তরিরে, হরিপদ ভব পারের তরিরে)
রাই অঙ্গে নীল শাড়ি হ'তেছে শোভন।
দোঁহা অঙ্গ মাখামাখি অপূর্ব্ব মিলন।।
(রূপের বালাই যাইরে, যুগল রূপের বালাই যাইরে)

[৪]

কোথা বৃন্দাবন বিলাসিনী মা আমার।
বুঝি অভিমানে, অভাজনে, দেখা দিবে না গো আর।।
কি জানি মা তব তত্ত্ব কি জানি তব মাহাত্ম্য
(তবে) এই মাত্র জানি সত্যরূপিনী,
না দিলে মা তুমি শক্তি, হয়না জীবের কৃষ্ণভক্তি,
তুমি শক্তি মুক্তি দাত্রী হেন শক্তি আছে কার।
(তবে) দয়াময়ী দয়া করে, দেখা দাও আসি কিঙ্করে,
(ঐ) রাঙ্গা চরণ নাহি হেরে, সব দেখি অন্ধকার।।

———

[খ] ১৩০৩ সালের ৬ই বৈশাখ নিম্নলিখিত কবিতাটি কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক রচিত হয় :–

সংসার লীলা।

১

এ সংসার রঙ্গভূমি–
অভিনেতা আমি তুমি
নানা বেশ ধরি, হেথা করি আগমন।
ঈশ্বর অধ্যক্ষ তার
নহে লীলা অন্য কার
তাঁহার আজ্ঞায় সব হ'তেছে চালন।।

২

বেশ-গৃহ পরলোক
তথায় সাজিছে লোক
যখন যা আজ্ঞা তিনি করিছেন দান।
নেপথ্য কারক বিধি
করি যত্ন নিরবধি
নানারূপ পরিচ্ছেদে জীবেরে সাজান।।

৩

কাহারে করিয়া সুখী
কোন জনে চিরদুঃখী
অপরে সাজান কভু ব্যাধি মূর্ত্তিমান।
কভু পিতা কভু মাতা
কভু ভগ্নী কভু ভ্রাতা
কভু বা সাজান তাঁরে স্নেহের সন্তান।।

৪

নৃশংসের ধরি মূর্ত্তি
কেহবা করিছে স্ফূর্ত্তি
পাপাকর্ম্মে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত র'য়েছে।
কারে বা সাজান পতি
কারে পতিব্রতা সতী
এইরূপে বহুজনে নিয়ত সাজিছে।।

৫

কেহবা বিধবা বেশে
অতি নিরজনে এসে
আঁখিনীর বৃষ্টিসম করিছে বর্ষণ।
বলে "নাথ, কোথা গেলে
অভাগীরে হেথা ফেলে
বিরহ-দহনে দগ্ধ প্রাণ মন।।"

৬

কেহবা দানেতে রত
বিতরিছে অবিরত
নানামত কল্পতরু সম হয় জ্ঞান।
কেহবা কৃপণ সাজি
ধনের মাহাত্ম্যে মজি
অনর্থ অর্থই ভাবে ইষ্টের সাধন।।

৭

কার্য্য করি সমাধান
হয় সবে অন্তর্ধান
আবার নূতন সাজে সাজিবার তরে।
এইরূপে ক্রমাগত
আসে যায় কত শত
কত নট কত নটী কিবা রঙ্গ করে।।

৮

পরমেশ লীলাকারী
তাঁর আজ্ঞা মান্য করি,
তাঁহার ইঙ্গিতে লোক যায় আর ফিরে।
নব সাজে সুশোভিত
আবার আসিবে কত
নিজ অংশে শেষ করি, পুনঃ যাবে ঘরে।।

৯

কিন্তু নাথ! কত আর
বহিব এ পাপভার
এ ভার বহিতে মোর নাহি যায় মন।
হলে যবনিকা পাত
এইবার করো নাথ।
রঙ্গভূমে যাতায়াত হয় নিবারণ।।

১০

চাহি না সাজিতে রাজা
উহাত জীবের সাজা

তব নাম ধ্বজা সম কিছু প্রিয় নয়।
পুনঃ যদি ভবে আসি
প্রেমনীরে ভাসি, ভাসি,
পাই যেন তব নাম নিত্য সুধাময়।।

[গ] কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ১৩১০ সালের ৮ই ভাদ্র তারিখে নিম্নলিখিত গানটী রচনা করিয়াছেন :-

"তোমায় ছেড়ে কোথায় এলাম পিতা।
দুস্তর সাঁতার এ ঘোর আঁধার
চারি ধারে তার মরম ব্যথা।।
উপরে চাঁদের জোছনা খেলে
অন্তরে শোকের ঢেউ উছলে,
হাসির সনে হতাশ রাশি
স্রোতের মুখে ঝরিছে হেথা।।
একে ক্ষীণ প্রাণ তাতে জোর টান
কর পিতঃ! আসি সন্তানে ত্রাণ,
চাহিব না আর আসিতে এখানে
লও তুলি' মোরে তুমি হে যেথা।।

[ঘ] কুমার নিত্যনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু উপলক্ষে তদীয় আত্মীয় ও বেদব্যাস পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কবিতা রচিত হয়।

১

পর-হিত-রত হৃদয় পবিত্র
আয়ত নবীন সুললিত কায়
ত্যজি, আজি সখে নিত্যনিরঞ্জন,
প্রিয়ব্রত তুমি চলিলে কোথায়!

২

কোথা কোন্ দেশে হৃদি-বেদনায়
সে কোন্ দরিদ্র উঠিল কাঁদিয়া,
গৃহ শূন্য করি গেলে চলি তাই
রক্ষিতে তাহায় নিজ প্রাণ দিয়া।

৩

অনন্ত জগতে অথবা কোথায়
হ'ল প্রয়োজন সগুণ শোভার,
বিধাতা তোমায় ডাকিলেন তাই
করিতে পূরণ অভাব তাহার।

৪

কিম্বা মোহময় ইহ মর্ত্ত্য-লোকে
পাপস্পর্শ তোমা পাছে হয় ব'লে,
সময় বিলম্ব সহিতে না পারি
জগন্মাতা তুলে লইলেন কোলে।।

৫

কাঁদেন প্রাচীন জনক জননী
আজিকে তাঁদের কি আশা নির্ম্মূল।
কাঁদে বীরভূম বীরপুত্র বিনা
কাঙ্গাল কাঙ্গালী কাঁদিয়া আকুল।

৬

কাঁদে ভ্রাতা ভগ্নী, আছড়ি ভূতলে
হাহাকার করি, স্মরিয়া তোমায়,
অবলা সরলা "নগেন" তোমার
কাঁদে দিবানিশি দেখহ হেথায়।

৭

প্রজাকুল সব কাঁদিয়া আকুল
স্মরিয়া তোমার অশেষ করুণা,
বাল বৃদ্ধা যুবা সকলে কাঁদিছে
কেহ নাই কারে করিতে সান্ত্বনা।

৮

তোমার কর্ত্তব্য তুমি করি গেলে
বহু পুণ্যে যাহা হয় না সম্ভব,

কত তপোবলে কত পুণ্যফলে
পারে না সাধিতে অল্পায়ু মানব।

৯

নবীন বয়সে সংসারীর বেশে
মুমুক্ষু সুলভ তপোধ্যান দান,
সাত্বিক ভাবেতে করিলে যে কত
স্মরিতে সে সব কেঁদে ওঠে প্রাণ।

১০

কত পুণ্যতীর্থে করিয়া ভ্রমণ
কত আতুরের নয়নের জল,
মুছাইলে তুমি আপনার হাতে
অন্ন বস্ত্র ধন দিয়া অবিরল।

১১

কিন্তু তোমা শোকে পিতা মাতা তব
কাঙ্গালের মত কাঁদেন কুমার,
আজিকে তাঁদের কে দিবে সান্ত্বনা
ঘুচাবে অনন্ত অশ্রু-বারিধার।

১২

আমরা আত্মীয় বান্ধব তোমার
সগুণে তোমার হ'য়েছি মোহিত,
কাহার মুখের সান্ত্বনা পাইয়া
বল দেখি ভাই হ'ব প্রবোধিত।

১৩

মনে হলে তব সে হাস্য বদন
সুন্দর সুঠাম দীর্ঘ কলেবর,
জিনিয়া সে কান্তি পূর্ণ শশধর
ফেটে যায় বুক, বিদরে অন্তর।

১৪

সান্ত্বনার কিছু না পাই খুঁজিয়া
শুধু এ প্রবোধ আছে ঘোর দুখে,
আর্য্য ধর্ম্ম প্রাণ আর্য্যের সন্তান
পুণ্যলোকে গিয়া আছ তুমি সুখে।

১৫

নগেন ভগিনি! কি দিব সান্ত্বনা
সহ্য কর শোক সাবিত্রী সমান,
অনন্ত মিলনে সুখী হ'বে পুনঃ
দু'দিনের খেলা হ'লো অবসান।

১৬

ক্ষান্ত হও পিতঃ! সম্বর বিলাপ,
উঠ মাত! আর ক'র না ক্রন্দন
অনিত্য সংসারে পাবে গো কেমনে?—
নিত্যধামে সেই নিত্যনিরঞ্জন!

———

[ঙ] রাজকুমারী নৃপবালা দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন[২] :-

শোকছ্বাস। [য]

"ভাই, ভগ্নি, স্বামী, সুত, শ্বশুর, শাশুড়ী,
পিতা মাতা পরিজনে শোকদগ্ধ করি,
কোন্ খানে গেলে বোন্? কোন্ পথ দিয়া?
কোথা হ'তে কে ডেকেছে নয়ন ছানিয়া?
বুকভরা ভালবাসা আশা আকিঞ্চন,
কেমনে পাষাণ-প্রাণে দিলে বিসর্জ্জন?
হেথাকার কত আঁখি ভাসিতেছে নীরে
কি করিয়াছিনু মোরা? কোন্ অপরাধে
অপূর্ণ যৌবন মাঝে—অপূরণ সাধে—

চলে গেলে? একবার ভাবিলে না মনে
চির বিরহের বোঝা সহিব কেমনে?
চলে গেলে—কেন গেলে? গেলে কোন্ পুর?
সেথা কি যায় না যাওয়া সে কি বড় দূর?
যে আগুন জ্বালিয়াছ হৃদয়ে সবার
একি রাবণের চিতা নিবিবে না আর?
দেবী তুমি, ছিলে হেতা মায়াদেহ নিয়া
আপন মহত্ব মাঝে আপনি ফুটিয়া।
ক্ষুদ্র ওহৃদয়খানি ভরা করুণায়
যেতে ত পারনা তুমি ছাড়িয়া আমায়।
তাই ভাবি, ভাবি আর বহে আঁখি ধার
কবে পুনঃ দেখা হবে তোমায় আমায়।
করতলে গণ্ড রাখি' মূরতি চিন্তার
ওই দাঁড়াইয়া পাশে প্রাণেশ তোমার।
কভু নাম ধরে ডেকে সরমে আকুল
কভু পাগলের মত কহে কত ভুল।
পাঁচ বছরের ছেলে না হেরে তোমায়
"কোথা মা" বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়।
মরি মরি শুকায়েছে কচি মুখ খানি
প্রভাতে তারাটি যেন, অশ্রুবদ্ধ বাণী।
এস গো বারেক এস দেখ গো আসিয়া
কি শোকের ছবি তুমি গিয়াছ আঁকিয়া।
কিংবা না-না, কাজ নাই আসি ভবতলে
শোকতুষানল হেথা নিরন্তর জ্বলে।
বাসে হলাহল ছুটে হেতা কুসুমের,
নিঃশ্বাসে প্রলয় হয় হেথা মানুষের।
দারুণ কৃতান্ত সদা ঘটায় জঞ্জাল
মাধবীরে লয় হরি বঞ্চিয়া রসাল।
বৃন্ত কাটি' নষ্ট করি প্রসুন সুন্দর
ব্যথা দেয় নিরন্তর দুরন্ত ভ্রমর।
তাই বলি থাক ভগ্নি শান্তি নিকেতনে,
অবশ্য সময়ে তোমা হেরিব নয়নে।।

———

[চ] রাণী পদ্মসুন্দরী দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে নিম্নলিখিত কবিতা হেতমপুর হাই স্কুলের জনৈক শিক্ষক শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত হয় ঃ–

১

হায়! আচম্বিতে একি সর্ব্বনাশ।
না দেখি না শুনি কভুরে এমন।
নাহি ঘন রব খর বায়ু শ্বাস
এ যে বিনা মেঘে অশনি পতন।।

২

সুপ্ত পুরবাসী নিশীথ সময়
সুখসুপ্ত সবে রাজপরিবার
পলকে প্রাসাদ সুখের আলয়
শোকে উতরোল উঠে হাহাকার।।

৩

ধন্য ধন্য মাতঃ! ভূপাল মহিষী!
একি মৃত্যু? দৈবী লীলা অবসান।
নহ মা মানবী, মূর্ত্তিমতী দেবী
ইচ্ছা মৃত্যু এই জ্বলন্ত প্রমাণ।।

৪

নিজ মুক্তি সেতু বেঁধেছ আপনে
বেঁধেছ কীর্ত্তির সুবর্ণ সোপান।
লভি দিব্যগতি বিমান গগনে
দিব্য লোকে দেবি, করিলে প্রয়ান [প্রয়াণ]।।

৫

সুখাভ্যস্ত রাজসুত বধূগণ
অশ্রুভরা মুখ দেখা নাহি যায়।
"কোথা মা" বলিয়া করিছে রোদন
নবনীত তনু ধুলায় লোটায়।।

৬

আত্মীয় স্বজন অমাত্য বান্ধব
শোকসিন্ধু মাঝে নাহি পায় কুল।
শব প্রায় সবে স্তম্ভিত নীরব
প্রজা ভৃত্যকুল শোকেতে আকুল।।

৭

কে কারে শান্তয়ে সকলে কাতর
মাতৃহারা আজি অগণ্য সন্তান।
বাল বৃদ্ধ যুবা তুলি' আর্ত্তস্বর
স্মরিছে জননী স্নেহের নিদান।।

৮

(আজি) নরদেব ভূপ সাগর গম্ভীর
হারায়ে মহিষী জীবন সঙ্গিনী।
ফেলেন নিভৃতে তপ্ত অশ্রুনীর
স্মরি গুণগ্রাম অতীত কাহিনী।।

৯

নহ মা শুধু ত কুমার জননী
যত পোষ্য তত তনয় তোমার
(আজি) অভাবে তোমার অনাথপালিনি!
অসংখ্য নয়নে বহে বারিধার।।

১০

শোকের প্রলয় তুলেছে জননি!
এই আকস্মিক তব তিরোধান।
প্রবোধ সন্তানে হে শান্তিরূপিনি!
সান্ত্বনা রূপেতে হ'য়ে অধিষ্ঠান।।

১১

রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী সমা
স্নেহ কোমলতা মাখা সুশাসনে।
মহিমাশালিনী তুমি রামরমা
রেখেছ যতনে অনুজীবিগণে।।

১২

যাও মাতঃ যাও চিরালোক লোকে
দেবাঙ্গনাসনে করহ বিহার।
চির সমুজ্জল [য] এ রাজভবন
থাকে রাজলক্ষ্মি [য]! প্রসাদে তোমার।।

১৩

যাও মাতঃ, যাও চিদানন্দ ধামে
তব যোগ্য নহে মরত নিবাস।
লভ "নিত্যানন্দ" শান্তি প্রাণারাম
পশিবে না যথা ত্রিতাপনিঃশ্বাস।।

১৪

বিরজিত যথা ক্ষীরোদশয়নে
পদ্মালয়াসনে পদ্মনাভ হরি।
তথায় মগনা চরণ সেবনে
যুগল-সেবিকা–শ্রীপদ্মসুন্দরী।।

১৫

হে রাজতনয়! সম্বর বিলাপ
স্থাপি' হৃৎপটে জননী-প্রতিমা।
কর পদপূজা ত্যাজি' মনস্তাপ
উথলিবে নিত্য রাজশ্রী-মহিমা।।

[ছ] বৃন্দাবন ধামে, ১৩১৪ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে, কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর নিম্নলিখিত গান রচনা করেন[৫] :–

(ওগো) সার হয়েছে আমার শুধু আঁখি জল।
আমার আশা বাসা ভেঙ্গে গেছে, মন হয়েছে বিচঞ্চল।।
ভব-মরু মাঝে কল্পলতা-সমা,
ছিল স্নেহময়ী করুণা-প্রতিমা,
ভাগ্যদোষে হায় হারায়ে সে মা,
হেরি সব শব-পুরী জলস্থল।।

আজনম সুখে ছিনু মত্ত হয়ে
মায়ের সোহাগে গেছে দিন ব'য়ে,
অকরুণ বিধি নিরমম হিয়ে
সাধে বাদ সাধি' হরিল সম্বল।।
আছে সব কিন্তু শুধু মা বিনে
সব শূন্যময় নেহারি নয়নে,
"মা মা" ব'লে আঁখি ভাসে নিশি দিনে
মন মাঝে যেন জ্বলে দাবানল।।
আর কেন ভবে কেঁদে কেঁদে মরি
"মা মা" বলে সদা ফেলি নেত্রবারি,
মিনতি শ্রীহরি যেন শীঘ্র করি
করি হে শ্রীহরি ব'লে "হরিবোল"।।[৬]

[জ] ১৩১৫ সালের ১৩ই ভাদ্র তারিখে, জামতড়া মোকামে, কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত গানটী রচিত হয় :–

ওগো আর কেন ভেবে কেঁদে মরি।
কিছু হ'ল না হবে না যাতনা যাবে না
অকূলের কূলে পাব না তরি।।
এসেছিনু ভবে লয়ে কত আশা
রচেছিনু কত সাধে সুখবাসা
(এখন) ভেঙ্গেছে সে আশা ঘিরেছে কুয়াসা
নিরাস তমস ভুবন ভরি'।।
ভগ্নহৃদে পুনঃ বল কি সঞ্চারে,
বজ্রাহত লতা পুনঃ কি মুঞ্জরে,
বাসি ফুলে অলি আর কি গুঞ্জরে,
(এখন) ঝর্ ঝর্ ঝরে শুধু আঁখি বারি।।
আর কেন ভবে মিছে ঘোরা ফেরা,
জন্ম জন্ম ঘুরে হইয়াছি সারা
মহিমার প্রাণ এবে জ্যান্তে মরা
(এখন) ত্বরা করি পার করহে শ্রীহরি।।

[ঝ] Remarks by Sir Richard Temple-October 1874.[৭]

"Babu Ram Ranjan Chakravarti owns estates which were visited by distress. he from the first set a good example to the neighbourhood, expended £1400 on relief works. remitted £3109 (or 1/10 of his yearly rent) maintained for 4 months a relief house, where 250 persons were fed daily, subscribed largely to relief funds and personally as well as through his efficient manager Mr. Reed Superintended the dispensation of the eharity."

Statement showing the amount of money spent from time to time by the Raja Bahadur of public good both in and out of his district.

Items	Amount
Maintenance of Medical Institution	39,616.
Maintenance of Educational Institution	1,42,795.
Charity & Public works	74,914.
Donation to Famine Fund	11,600
Improvements in Arts	9,070
Total...	2,77,995.

[ঞ] Quotation from the report of the University Inspectors submitted by them to the Syndicate of the Calcutta University in 1908.[৮]

"It is very charming to hear of the foundress Rani Padma Sundari Devi— to whom the idea and the endowment of the College are entirely due. It is difficult to comprehend, how a

conception of the value of education that was worthly of the nation-builders of Germany and Japan could have penatrated behind the purdah of a remote Rajbari in the heart of Bengal before it had come to be dreamt of by a few of the most enlightened of the Bengali men as a distant ideal to be aspired after but never materialised. While the dominant seets were, generally, still talking about the benefits of higher education and while her immediate male relatives must have gravely doubted its slightest utility, the 'subjected' woman actually invested her whole property in that education which was to bring about r..perty in that education which was to bring about the s...tion of her country.

ক. ঁবৃন্দাবনধামে রাণী মাতার সমাজ-মন্দির গাত্রে এই গানটী ক্ষোদিত আছে।

খ. অতঃপর রামরঞ্জন ১৮৭৫ সালের ১২ই মার্চ তারিখে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন।[১]

[ট] হেতমপুর রাজবংশাবলী